বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা—২৩নং কেথিড্রাল মিশন লেন হইতে
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা,
৪নং কলেজ স্কোয়ার "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রেসে
শ্রীনন্দলাল বেরা দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৫ সাল।

মূল্য ছয় আনা।

বিজ্ঞাপন।

কতিপয় বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যানুরাগী মহোদয়ের যত্নে ১৩০৪ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে কলিকাতা বিডনষ্ট্রীটস্থ এমারল্ড থিয়েটর গৃহে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ একটী সভা আহূত হয়। সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এই সভায় সভা পতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে বিদ্যা সাগর মহাশয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার জন্য একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে আমি কয়েকটী বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হই। কতক সেই অনুরোধ রক্ষার জন্য, কতক নিজে অনেক দিন হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আচার, ব্যবহার, স্বভাব, চরিত্র, কার্য্যাদি সম্বন্ধে কিছু লিখিব বা বলিব এরূপ ইচ্ছা করিতে ছিলাম তজ্জন্য, এই সামান্য প্রবন্ধ পাঠে প্রবৃত্ত হই। বহুকাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই নিজে শুনিয়াছি, অনেক ব্যাপারই নিজে দেখিয়াছি; তন্মধ্যে

গোটাকত কথা মাত্র এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হই- য়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে এই প্রবন্ধ প্রণয়নে আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের প্রণীত বিদ্যা- সাগর মহাশয়ের জীবনী ও অপরাপর দুই এক খানি পুস্তক হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। প্রবন্ধ পাঠের পর অনেক ভদ্রলোক বিদ্যা- সাগর মহাশয়ে প্রতি ভক্তিপ্রবণতা নিব- ন্ধন প্রবন্ধটী ছাপাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের সেই অনুরোধ রক্ষার জন্যই এই প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এস্থলে কর্ত্তব্যবোধে বলা আবশ্যক যে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয়বন্ধু বঙ্গসাহিত্যে সুপরি চিত ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহায্য না পাইলে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত না।

চাপাতলা-কলিকাতা
১১ চৈত্র ১৩০৫ সাল। } শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বিদ্যাসাগর—প্রবন্ধ।

রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমিতে কত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বীয় স্বীয় জীবনে কত প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, ভারতের নাম চিরকালের জন্য সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শৌর্য্য বীর্য্য বলুন, ধর্ম্ম কর্ম্ম বলুন, প্রজ্ঞা প্রতিভা বলুন, দয়া দাক্ষিণ্য বলুন, ভারত ইতিহাসে কিছুরই দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই সকল মহাত্মা ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় নামের সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির নাম জগতে চিরপ্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ যে এত নির্ব্বীর্য্য, কাপুরুষ আজও আমরা সেই মান্ধাতা সগর, ভীমার্জ্জুন, পৃথু প্রতাপাদির দেশবাসী বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। আজ আমরা ধর্ম্মকর্ম্মহীন হইয়াও নারদ, জনক, যুধিষ্ঠিরাদির নাম স্মরণ করিয়া আমাদের জীবন পবিত্র করিতে পারি। আমাদের এখন প্রজ্ঞা

প্রতিভার লেশ মাত্র নাই, তবু ও আমরা সেই ব্যাস, বাল্মিকী, কণাদ, পতঞ্জলি, কালিদাস প্রভৃতি জগন্মান্য মহাত্মাগণের স্বদেশবাসী বলিয়া, স্পর্দ্ধা করিতে পারি এবং সময়ে সময়ে স্পর্দ্ধা করিয়াও থাকি। আর দয়া দাক্ষিণ্যের কথা আমাদের একালে না বলাই ভাল। আমরা যে, মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণ হরিশ্চন্দ্রাদির জন্মভূমি ভারতের অধিবাসী, একথা স্মরণ করিতেই সাহস হয় না। এইরূপ বহু সংখ্যক মহাত্মা ভারতে নানা সময়ে নানা স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কে কবে ঠিক কোথায় ভূমিষ্ঠ হন তাহার কোন নিদর্শন নাই। তাঁহাদের মানব-সাধারণ কার্য্যের কোন প্রকার বর্ণনাই কোথাও পাওয়া যায় না। বোধ হয় কোন দরকার ও নাই। বড়ই হউন বা ছোটই হউন সকলেই একদিন এক স্থানে কোন না কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাহা জানাতে বিশেষ কোন লাভ নাই, না জানাতেও ক্ষতি নাই। যাহা অলৌকিক, যাহা মানব সাধা-

তাহাই স্মর

কীর্ত্তনযোগ্য। কালে তাহা লয় করিতে পারে না, মানুষ তাহা ভুলিতে পারে না। এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এই সকল মহাত্মাগণের বা ইহাঁদের সম্বন্ধে ঘটনা বিশেষের অবিকল স্থান ও কাল নির্ণয় জন্য কত পরিশ্রম ও কত ব্যয় করিতেছেন। তাঁহাদের ভীষণ গবেষণা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়, সময়ে সময়ে হাসি ও পায়। যাহা হউক একালে ইহা একটা বড় কার্য্য, পণ্ডিতোচিত কার্য্য, বড় বাহাদুরির কার্য্য। আমার ন্যায় ছোট মুখে বড় কথা ইহার প্রতিকূলে বলা নিষ্প্রয়োজন। বলিতেছিলাম এই যে মহাত্মাগণের মহৎ কীর্ত্তি কলাপই লোকের স্মরণ থাকে। ভীষ্ম কোন্ দিন কোন্ সময়ে ঠিক কোথায় ভূমিষ্ঠ হন, তাহা আমরা জানি না; ক্ষতি কি? তাহাতে ভীষ্ম ও মারা পড়েন নাই আমরাও তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই। সেইরূপ সকল মহাত্মার সম্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। এই যে আমরা ইংরাজীতে রাশি রাশি জীবনচরিত দেখিতে পাই, বাস্তবিকই একটা জাতির ভিতর

এত অল্প কাল মধ্যে এত প্রকৃত লোক সাধারণের অতীত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই জন্মিয়াছেন কি? এবিষয়ে আমার ঘোর সংশয়। আরও আমার বিশ্বাস এইরূপ জীবন চরিত লিখিয়া ছাপাইয়া প্রচার করিয়া কি এই সকল লোককে কেহ চিরস্মরণীয় করিতে পারিবেন। তাহা কখনই হইবে না॥

মানুষ মরিয়া গেলে আর সবই ফুরাইয়া যায়, থাকে কেবল তাঁহার চরিত্র ও গুণ। সে আবার কিরূপ চরিত্র, কি প্রকার গুণ? লোক সাধারণ চরিত্র বা গুণ নহে। লোকাতীত চরিত্র ও গুণ। তুমি আমি জন্মিয়াছি, কাজ কর্ম্ম করিতেছি, আহার নিদ্রা করিতেছি, রোগে শোকে ভুগিতেছি, সুখে দুঃখে জীবন কাটাইতেছি, তাহার পর মানবলীলা সংবরণ করিব। সব ফুরাইয়া যাইবে। আমাদের আবার স্মরণ কে করিবে, কেনইবা স্মরণ করিবে? যদি সহস্র পৃষ্ঠা বিশিষ্ট জীবনচরিত লিখিত ও মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে প্রচারিত হয় তাহাতেও আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না।

তবে সে আবর্জ্জনা গুলার প্রয়োজন কি?
—অভিমান। কালের কাছে আদর আবদার
নাই, মান অভিমান নাই। তুমি আমি হাজার
চেষ্টা করি, কালের নিদারুণ হস্তে এসমস্তই
বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত হইবে।

কেহ মনে করিবেন না যে আমি এত
কথা কেন বলিতেছি, এ সব ধান ভানিতে
শিবের গান কেন? এখন বক্তব্য বিষয় ছাড়িয়া
অপ্রাসঙ্গিক কথায় কাল ক্ষেপ কেন? অপ্রা-
সঙ্গিক নহে। যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার
নাম করিয়া আমাদের জীবন পবিত্র করিবার
জন্য আজ আমরা প্রয়াস করিতেছি, উপরে
লিখিত মহাত্মাগণের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম,
তাঁহার সম্বন্ধে ও তাহাই প্রযোজ্য। তাঁহার
অসীম গুণের কথঞ্চিৎ কীর্ত্তন করাই আমার
অদ্যকার কার্য্য। তাঁহার জীবনচরিত
বর্ণন করা আমার কার্য্য নহে, সাধ্যও
নহে। মহাত্মা তাঁহার পিতামাতার সন্তান।
অমুক দিন অমুক সময়ে, অমুক জেলার অন্ত-
র্গত অমুক গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতা মাতার

স্নেহ ভালবাসায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এ কথা আপনারা নাই শুনিলেন।

যে মহাত্মার গুণ সমুদ্রের কণামাত্র অদ্য আমি বর্ণন করিতে পারি কি না সন্দেহ। তিনি একজন অতি মহতী প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার দিগন্তব্যাপিনী প্রতিভার কথা আমা অপেক্ষা সহস্র গুণে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদ্বারা উপযুক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ আমার ধারণা প্রতিভা মানুষের সঙ্গে জন্মে। ইহা প্রাক্তনকর্ম্মজাত, ভগবানপ্রদত্ত, আজন্ম লব্ধ গুণ। চেষ্টা করিয়া ইহা পাওয়া যায় না। সকলের ইহা সমান থাকে না। ঘসিয়া মাজিয়া ইহার চাকচিক্য সাধন করা যায় মাত্র। আমরা প্রকৃত প্রতিভাশালী মহাত্মা খুব কমই দেখিতে পাই। যখন দেখিতে পাই তখন সৃষ্টির অপরাপর আশ্চর্য্য পদার্থের ন্যায় আমরা দেখিয়া চমৎকৃত হই, যাঁহার সেই প্রতিভা তাহাকে দেখিয়া চমৎকৃত হই, যিনি তাঁহাকে সেই প্রতিভা দিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভক্তি

সহকারে মন আকৃষ্ট হয়, আপনা আপনি ধন্য মনে করি। তাহাতে আমাদের কোন উপকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। পর্ব্বতের স্থৈর্য্য, সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, কুসুমের মাধুর্য্য আমরা দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহা হইতে আমরা কিছু স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য শিক্ষা করি কি? তাহা করি না। প্রতিভা ও সেই রকম জিনিষ। ইহার পর্য্যালোচনা করিতে সময়ে সময়ে আমোদ হয় বটে কিন্তু তাহাতে আমরা বিশেষ কোন উপকার পাই না। তজ্জন্য আমার বিবেচনায় যাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের কোন উপকার নাই, এমত নিঃস্বার্থ আমোদ-এখন নাই করিলাম

আমরা সকলেই স্বার্থপর, কমবেশী পরিমাণে হউক, সকলেই স্বার্থপর; স্বার্থের আকার প্রকার ভেদ হইতে পারে কিন্তু সকলেই স্বার্থপর। এই যে আজ আমরা এতগুলি লোকে সেই মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিতে সমবেত; ইহাতে কি স্বার্থ নাই? স্বার্থ আত্মপ্রসাদ, স্বার্থ তাঁহার গুণ কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের জীবনে যতটা সাধ্য সেই

সকল গুণ যাহাতে বর্ত্তায় তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা একান্ত চেষ্ট করা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় জগন্মান্য লোক জগতের চিরন্তন শিক্ষক। যত দিন জীবিত থাকেন সাক্ষাত পক্ষে আদেশ উপদেশ দ্বারা, তিরস্কার পুরস্কার দ্বারা, দেখাইয়া শুনাইয়া, বুঝাইয়া পড়াইয়া, নানা প্রকারে শিক্ষা দেন, আর জীবনান্তে লোকাতীত সৎগুণের সহস্র দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়া চির কাল লোক শিক্ষা দিয়া থাকেন। সুতরাং ইহাঁরা মরিয়াও মরেন না, মানবলীলা সংবরণ করিয়াও মানবকে শিক্ষা দিতে ছাড়েন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে আমরা এই রূপ কি কি দৃষ্টান্ত পাইয়াছি এবং তাহা হইতে কি শিক্ষা পাইতে পারি, আজ আমরা তাহারই কিছু কিছু আলোচনা করিব।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন করিতে গিয়া, প্রথমেই ঘোর বিভ্রাট। কোন্ কথাটী আগে বলি। আমাদের ক্ষীণ চক্ষু তাঁহার তেজস্বীগুণগ্রামের মহিমায় ঝলসাইয়া যায় কিছুই ঠাওরাইতে পারিতেছি না, যে

কোন্‌টী আগে বলি কোন্‌টী পরে বলি। তাঁহার জীবনে বলিবার কথা যেমন অধিক, আমাদের সময়ও তেমনি সংক্ষিপ্ত এবং তাহা অপেক্ষা সংকীর্ণ আমার ক্ষমতা। যাহা হউক প্রলাপের মত যখন যাহা মনে আইসে গোটা-কতক কথা মাত্র বলিয়া যাই।

প্রথম কথা—লোভহীনতা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এত বড় লোক বলিয়া জগতে এত মান্য তাহার কারণ কি? কত কত লক্ষপতি, কোটীপতি ধনাঢ্য ভারতে জন্মিতেছেন, মরিতেছেন, কে কাহার খোঁজ খবর রাখেন? কত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতেছেন, যাইতেছেন, কে তাহার হিসাব রাখে? তবে আমরা কি জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এত পদাবনত?

এই সাম্যবাদের দিনে, এই সমাজের বিশৃঙ্খলার কালে, আমরা তাঁহাকে সমবেতস্বরে আমাদের পূজ্য, দৃষ্টান্ত স্থানীয় বলিয়া স্বীকার

করি কেন? তাহার উত্তরে সেই একটী প্রাচীন শ্লোকার্দ্ধ মনে পড়ে "আশা দাসী কৃতা যেন, তেন দাসায়তে জগৎ।" যিনি আশার কুহুকে ভুলেন না, লোভে মজেন না, জগৎ তাঁহার দাস। আমরা তাঁহার দাসানুদাস। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোভ লালসা শূন্য ছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজমুখ হইতে শ্রুত, দুই একটী গল্প বলিতেছি। দুইবার তিনি চাকরি ছাড়েন, তাহা বোধ করি অনেকেই জানেন। একবার চাকরি ছাড়ার পর তাঁহাকে তাঁহার জনৈক স্নেহশীল মুরুব্বি সাহেব ডাকিয়া লইয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যাইবা মাত্র সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, "বিদ্যাসাগর তুমি খাইবে কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় কথার তাৎপর্য্য বুঝিয়াও বুঝিলেন না, ভাণ করিয়া, পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "মহাশয় কি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন আমি কি খাইব।" সাহেব তাহাতে একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ পরিত্যাগ কর। আমি তোমার আয়ব্যয়ের সমস্ত বৃত্তান্তই জানি।

তোমার ত কিছুই সংস্থান নাই, সংস্থান করিতেও পারিবে না, তুমি যে চাকরি ছাড়িলে, তোমার চলিবে কি করিয়া।” এতদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন যে, তিনি জনৈক ভৃত্যের নিকট তাহা শিক্ষা করিয়াছেন, সে শিক্ষাটী এই।

যে সময়ে এই কথোপকথন হয় তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় বড় ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত হন। চিকিৎসকেরা স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থান পরিবর্ত্তনদ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বর্দ্ধমানে যান। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বর্দ্ধমান যাওয়ার কথা শুনিয়া কেহ হাসিবেন না। তখন এই ভারতের সীমান্তব্যাপী লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হয় নাই, যে লোকে মনে করিলে লাহোর বা বোম্বাইয়ে, অথবা ষ্টীমার যাত্রা এত প্রচলিত হয় নাই যে সহসা মান্দ্রাজ বা কলম্বো যাইবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ সকল স্থানে যাইবার বিষয় মনে উদয় হয় নাই, বৈদ্যনাথ, মধুপুর পর্য্যন্ত তাঁহার মনে হয় নাই। কাজেই বর্দ্ধমানে স্থান পরিবর্ত্তন

জন্য গেলেন। তখন বর্দ্ধমান বড় স্বাস্থ্যকর স্থান। যদিও তখন তথায় ইংরাজী কেতায় মিউনিসিপালিটীর সৃষ্টি হয় নাই, কলের জলের অনুষ্ঠান হয় নাই, সহরের এখনকার মত শৃঙ্খলা সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না, তবুও তখন বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সুতরাং বর্দ্ধমানে গিয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন। কিন্তু সেখানে রোগীর পক্ষে একটী বড অসুবিধা ছিল। ভাল দাদ-খানি চাউল পাওয়া যাইত না। সে জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা হইতে কিছু পুরাতন সরু দাদখানি চাউল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। যে ঘরে তিনি প্রতি-নিয়ত থাকিতেন, সেই ঘরের এক কোণে সেই চাউলের পাত্রটী থাকিত। একদিন তিনি সেই ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার জনৈক ভৃত্য আসিয়া উক্ত চাউল তিন মুষ্টি একটা পাত্রে করিয়া লইয়া গেল। ভৃত্য ভিক্ষা দিবার জন্য বহুকষ্টে আনীত রোগীর অনন্যোপায় দাদখানি চাউল লইয়া গেল মনে

করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু অসন্তুষ্ট হইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভিক্ষাজন্য স্থানীয় চাউল লইবে, এ চাউল এখানে পাওয়া যায় না, ফুরাইলে বড় কষ্ট হইবে, এচাউল লইও না।" তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিল, প্রকৃত জ্ঞানোদয় হইল। ভৃত্য বলিল "মহাশয় ভিক্ষার জন্য তিন মুষ্টি চাউল লই নাই, আপনার আহারের জন্যই লইয়াছি।" এই কথা বলিয়া ভৃত্য কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত লাগিল। কথা সামান্য, কিন্তু সময়ে সময়ে ঐরূপ সামান্য কথায় বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায়। এমনি একটা সামান্য কথা, "দিন আথের হুয়া," শুনিয়া পাইকপাড়া রাজবংশের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ব্বপুরুষ, স্বনামখ্যাত, লালা বাবু বৈরাগ্য অবলম্বন করেন এবং বহুবিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া বৃন্দাবনধামে নিজ কীর্ত্তিকলাপ স্থাপন করিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভৃত্যের সেই কথা কয়টীর যে ফল ফলিল তাহা অতি মহৎ,

অতি গুরুতর। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিলেন "ভাল তিনমুষ্টি তণ্ডুলে যাহার দিনপাত হয় তাহার অর্থোপার্জ্জন জন্য এত কষ্ট কেন? পরাধীনতায় জীবন শেষ করা কেন? ব্রাহ্ম-ণের ছেলে তিনদ্বারে দাঁড়াইলেই তিন মুষ্টি পাইব, তবে আবার পরপদ সেবার প্রয়াস কেন?" এইরূপ কথা মনে আসিল, মন প্রফুল্ল হইল, মনে এক অদ্ভুত পূর্ব্ব আনন্দ পাইলেন। ভৃত্যকে পুনরাহ্বান করিলেন এবং বাক্স হইতে দুইটী টাকা লইয়া তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, "বাপু, তুমি আমার গুরু। আমি এতদিন এত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণের নিকট যে শিক্ষা পাই নাই, এত শাস্ত্রালোচনা করিয়া যে জ্ঞান পাই নাই, আজ তোমার নিকট সেই শিক্ষা পাইলাম, সেই জ্ঞানলাভ করিলাম। তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার গুরু। তুমি গুরু দক্ষিণা স্বরূপ এই দুইটী টাকা লও।" বিদ্যা-সাগর মহাশয় কি জানিতে পারিলেন? জানি-লেন যে তিন মুষ্টি তণ্ডুলে তাঁহার দিনপাত হয়। আর কি ভাবিলেন, ভাবিলেন যে ব্রাহ্মণের

ছেলে তিন দ্বারে দাঁড়াইলে তিন মুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ হইবে, তজ্জন্য পরাধীনতা কেন? ধন্য তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ধন্য তোমার ব্রহ্মতেজ! এইত ব্রাহ্মণের প্রকৃত লক্ষণ, এইত প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব। "তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চাদি" ব্রাহ্মণ লক্ষণ ব্রাহ্মণের, সামাজিক ব্রাহ্মণের, বাহ্যিক সাধারণ লক্ষণ মাত্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ ভিতরের জিনিষ। লোভ লালসাহীন হওয়া ব্রাহ্মণের প্রধান কর্ত্তব্য। যিনি চরিত্রবলে রাজাধিরাজেরও পূজ্য, যিনি গুণগরিমায় সমগ্র ভারতে সমাদৃত, তাঁহার গোটাকত বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র থাকিলে চলিবে কেন? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্রাহ্মণত্বের এই সকল বাহ্যিক লক্ষণ, যজ্ঞসূত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু ভিতরে তিনি খাটী ব্রাহ্মণ। এই ভারতের দারুণ দুর্দ্দিনেও তাঁহার ব্রহ্মতেজ সমুদ্ভাসিত হইয়া ছিল। রাজদ্বারে প্রভূত সম্মান, উচ্চপদের দারুণ অভিমান, অর্থাগমের অমোঘ উপায়, ভোগবিলাসের, বিষয় বৈভবের সোপান সমস্তই তিনি পদাঘাতে বিদূরিত করিলেন। মনে ভাবিলেন কি?

ব্রাহ্মণের ছেলে তিন দ্বারে দাঁড়াইলে তিন মুষ্টি পাইব, তাহাতেই আমার চলিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে পারেন তিনিই ব্রাহ্মণ,—ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হইয়া যিনি অর্থলোভে দিবানিশি দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন, কিছুতেই তৃপ্তিনাই, আশা মেটে না, সহস্র হইল ত লক্ষ চাই, লক্ষের পর লক্ষাধিক, ধিক সে ব্রাহ্মণ,তাহার আবার ব্রাহ্মণ্য কোথায়? তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জাত বণিক, তিনি ত্রিসন্ধ্যা করুন, বিষ্ণুপূজা করুন, তিলকযজ্ঞসূত্র ধারী হউন, তিনি ব্রাহ্মণের চিত্রমাত্র; ব্রাহ্মণত্ব তাঁহাতে নাই। অর্থলোভী ব্রাহ্মণতনয়ের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, পদলোভী, সম্মানাকাঙ্ক্ষী আভিজাত্যাভিমানী, বিলাসী ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়। আমরা সর্ব্বদাই আক্ষেপ করি ভারতের দুরবস্থার জন্য। আর আমাদের এখন যেরূপ বুদ্ধি সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কতই ভারতের উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করি। কিন্তু কখন কি আমরা ভাবি ভারতের সার কি? ভারতের প্রাণ কোথায়? ভারত

কিসে এত বড় ছিল? আবার কি করিলেই বা সে মহত্ত্ব পুনঃ লাভ করিতে পারে। ভারতের সার ব্রাহ্মণ, ভারতের প্রাণ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের তেজে ভারত বড় হইয়াছিল, আর ব্রাহ্মণত্বের অবনতিতেই ভারতের অবনতি হইয়াছে। যে হস্ত দ্বারা ষড়্দর্শন উপনিষদাদি ভারতের কীর্ত্তি-স্তম্ভ সমূহ গ্রথিত হইয়াছিল, সে হস্ত ভিক্ষালব্ধ অন্নদ্বারা পরিপুষ্ট। সেই সকল মহাত্মা কখন খাট পালঙ্কে শয়ন করেন নাই, চেয়ার টেবিল দেখেন নাই, যান বাহন জানিতেন না, ভোগ-বিলাসের দাস ছিলেন না, যেমন তেমন করিয়া উদরান্ন চলিয়া গেলেই হইল, তাহাতেই পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। এই সেদিনকার একটী কথা বলি। নবদ্বীপে রমানাথ বলিয়া একজন প্রগাঢ় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। একদিন রমানাথ চতুষ্পাঠীতে বসিয়া সম্মুখে গ্রন্থ রাখিয়া চিন্তায় একাগ্রমনা হইয়া আছেন। এমত সময় তাঁহার পশ্চাদ্দেশে কৃষ্ণনগরের তদানীন্তন রাজা সমুপস্থিত। রমানাথ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া

শাস্ত্র চিন্তায় নিমগ্ন। কে আসিয়াছেন তৎ প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। কিছুক্ষণ পরে নজর পড়িল, অপ্রতিভ হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন। রাজা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অসঙ্গতি হইয়াছে কি ?" ভট্টাচার্য্য তখনও ন্যায়ের অসঙ্গতি ভাবিলেন,বলিলেন "না অসঙ্গতি নহে অপর বিষয় ভাবিতে ছিলাম।"রাজা হাসিলেন। তাঁহার সাধু ভাষা প্রয়োগ স্থানোচিত হয় নাই ভাবিয়া স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভট্টাচার্য্য মহশায়ের কোন কিছু অভাব আছে কি ? তদুত্তরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা শুনুন; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "মহারাজ, আপনার প্রদত্ত ভূমি হইতে কৃষকেরা যে তণ্ডুল দেয় তাহাতে আমার সশিষ্য অন্নের সংস্থান বেশ আছে। আর ব্যঞ্জন জন্য কোন ভাবনা নাই। এই সম্মুখস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষটী দেখিতেছেন, ইহার ফল চয়ন করি, পত্রও চয়ন করি তাহাতেই আমাদের যথেষ্ট সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়,

আমার কোন অভাব নাই।" শুনিলেন ব্রাহ্মণের কি উত্তর; তিন্তিড়ীপত্রোপকরণে জীবন রক্ষা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট। আর অবস্থাটী কিরূপ। রাজা স্বয়ং অভাব আছে কি না সেবিষয়ে জিজ্ঞাসু। এখন কি আমি স্পষ্ট বলিতে পারিয়াছি যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিতে কি বুঝি, কি চাই। ব্রাহ্মণ অর্থের দাস হইবে না, পদের দাস হইবে না, পরের দাস হইবে না; ব্রাহ্মণকে দাসত্বে আনে কে? অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বস্ত্রাঞ্চলে কাহার সাধ্য আবদ্ধ রাখে। সে সমস্ত দগ্ধ করিয়া স্বমূর্ত্তি ধারণ করিবেই করিবে। নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবে, তেজ দেখাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্লোভতা সম্বন্ধে অপর একটী কথা বলি। যখন বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রথম প্রচারিত হয় সে সময় বাঙ্গালা ভাষায় সে খানি প্রধান পুস্তক ছিল। এখনও যে ইহার স্থান কিছু নীচু হইয়াছে আমার তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালা ভাষার উচ্চতর পরীক্ষায় উহা নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক ছিল। যথেষ্ট বিক্রয় হইত। এক দিন তাঁহার জনৈক

হিতৈষী সাহেব বন্ধু, নাম আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কাপ্তেন মার্শেল হইলে হইতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন যে, তিনি উক্ত পুস্তকের এক সংস্করণের সমস্ত টাকা লইবেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্মত হইলেন। সাহেব সমস্ত সংস্করণ বিক্রয় করিয়া ব্যয় বাদে তিনসহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি বড় অমিতব্যয়ী—কখন কিছু রাখিতে পার না, এই কাগজ রাখ, নষ্ট করিও না।" বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃতজ্ঞতার সহিত সাহেব প্রদত্ত কাগজ লইয়া বাটী গেলেন। রাত্রিতে একবার মনে করিলেন তিন হাজার টাকার কাগজ, কেমন একটা ভাঙ্গা রকম, এটা পাঁচ হাজার করিবার চেষ্টা করিবেন। পরক্ষণেই মনে করিলেন—কি সর্ব্বনাশ! কি ভাবিতেছি। এ কোম্পানির কাগজ নয়, এযে সর্ব্বনাশের বীজাঙ্কুর,—তিন হইতে পাঁচ, পাঁচ হইতে দশ,

দশ হইতে বিশ, এইরূপে ক্রমাগত অর্থসঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, তাহাতে মন মজিলেই আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এখন আমার উপায় কি? এই ভাবনায় তাঁহার মন এত ব্যথিত হইল, মনে এত উদ্বেগ উপস্থিত হইল, তিনি রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হয়। রাত্রি প্রভাত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভাত হইবামাত্র অনন্যমনা হইয়া যে কোন প্রকারে হউক কাগজ বিক্রয় করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। ভাবিলেন ঘরে যে কাল সাপ রাখিয়া ছিলেন তাহা দূর করিয়াছেন, এখন নিশ্চিন্ত। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সামান্য চিন্তা আসিল, হিতৈষী সাহেব বন্ধু স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার উপকার উদ্দেশ্যে যাহা করিয়াছেন তাঁহার কাছে কি বলিবেন। ভাবিতে ভাবিতে সাহেবের বাড়ী গেলেন, প্রথমেই বলিলেন আমি আপনার নিকট একটী বিষয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমি আপনার নিকট অশেষ অপরাধ করিয়াছি আপনি

ক্ষমা করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলে আমি বলিতেছি। সাহেব ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না, এতবড় অপরাধটা কি? অভয় দান করিলে বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বকৃতাপরাধ ব্যক্ত করিলেন। কাগজ লইয়া যাওয়া হইতে বিক্রয় করা পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন। সাহেব বুঝিলেন তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য বিফল হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিলেন তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য সফল হইল। সাহেবেরা বড়একটা এমত ব্রাহ্মণ দেখিতে পান না বলিয়াই আমাদিগকে সর্ব্বদা অর্থের কুহকে প্রলোভিত করিয়া কত প্রকারে লাঞ্ছিত করেন। তাঁহারা জানেন না যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের কাছে অর্থ অনর্থের মূল, অর্থ সঞ্চয় অপেক্ষা বিপদ আর কিছুই নাই। হায়! এ প্রকার ব্রাহ্মণ আর অধিক নাই, তাই আমাদিগকে প্রতিনিয়ত এত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের কষ্টের কারণ আমরাই করি, পরকে নিমিত্তের ভাগী করি মাত্র।

দ্বিতীয় কথা—ভোগবিলাস।

যে কথা বলিতেছিলাম, আমাদের আপনাদের বিপদ্ আমরা আপনারাই ঘটাই। আমাদের কষ্টের কারণ আমরা আপনারাই সৃষ্টি করি। পরকে অকারণ নিমিত্তের ভাগী করি মাত্র। এই যে আমরা চারিদিকে নানাপ্রকার অভাবে পরিবেষ্টিত মনে করি,বাস্তবিকই কি আমাদের এত অভাব, এত কষ্ট, না আমরা পরের দেখিয়া অন্যের অনুকরণে আপনারা এই সকল অভাব ও কষ্ট সৃষ্টি করিয়া বাড়বানলের মত, গুটী পোকার ন্যায়, নিজের জালে নিজে জড়াইয়া মরি। আপনার অন্তরের আগুণে আপনারা দগ্ধ হই। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কতবার বলিতে শুনিয়াছি, আমরা গরীব বামুনের ছেলে আমাদের অভাব কি? আমাদের গাড়ী ঘোড়ার দরকার নাই, শাল রুমালের প্রয়োজন নাই, মোটাভাত মোটা কাপড় এক রকম করিয়া চলিয়া গেলেই হইল। যাহাদের তাহা না হইলেই চলে না

তাহাদের বড় কষ্ট, বড় বিপদ। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় জীবনে দেখাইয়াছেন যে, বাস্তবিক তাঁহার গাড়ী ঘোড়ার দরকার ছিল না। ইচ্ছা করিলে যে শ্রেণীর লোকে আজ কাল গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে গাড়ী ঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিতেন না তাহা নহে। তাঁহার মনে সে ইচ্ছা ছিল না। তিনি চিরদিনই পদব্রজে যাইতেন, তবে নিতান্ত অসমর্থ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভযান পাল্‌কীর সাহায্য লইতেন মাত্র। বেশভূষার সম্বন্ধে 'অধিক কি বলিব, সেত অধিক দিনের কথা নয়। আজও আমরা অন্তরে তাঁহাকে প্রত্যহই দেখিতেছি। সেই সামান্য চটী চর্ম্মপাদুকা শোভিত পদযুগল, সেই স্বল্প মূল্যের শুভ্র থান কাপড়ের উপর পরিষ্কার অথচ সামান্য মোটা থান চাদর, সেই অধ্যাপকোচিত মুণ্ডিত অসীম বিদ্যাবুদ্ধির খনি মস্তকমণ্ডল, তাহাতেই তাঁহার কত শোভা, সে সৌন্দর্য্য দেখে কে? সে শোভা বসনের নয়, সে শোভা ভূষণের নয়, সে

শোভা, সে সৌন্দর্য্য তাঁহার নিজের। যে রমণী প্রকৃত সুন্দরী, তাঁহাকে কতকগুলি রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিলে প্রকৃতির অপমাননা করা হয়, যেন তত সুন্দরী দেখায় না। সৌন্দর্য্যের খুঁত ঢাকিবার জন্যই বস্ত্রালঙ্কারের প্রয়োজন। যাহার সে খুঁত নাই তাঁহার আবার বস্ত্রালঙ্কারের আড়ম্বর কেন? যে ব্যক্তি, কার্য্যগুণে, চরিত্র বলে, কীর্ত্তিকলাপে, গুণাধিক্যে স্বনামখ্যাত, তাঁহার বেশভূষার আড়ম্বরের দরকার কি? বেশভূষা জনসমাজে তাঁহার আদর বাড়াইবে না। কিন্তু যাহার নিজের সে গুণগরিমা নাই তাহার মনে হয়, হয়ত বাহ্য আড়ম্বরে তাঁহার মূল্য বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু তাহা কি হয়? মানুষ পুতুল নয় যে বাহিরের চাক্‌চিক্য বাড়িলে, চক্ষে চটক দেখাইতে পারিলে, নিজের শোভ দেখাইতে পারিলে লোকে চমৎকৃত হইবে। লোকে জীবন্ত মানুষের কাছে মনুষ্যত্ব চায়, যেখানে তাহা পায় সেখানে আদর-অপেক্ষা স্বতঃই করে, আর যেখানে তাহার অভাব যেখানে রঙ্গে রাঙ্গ্‌তায়, পোষাকে আন-

বারে লোকলোচনে ধুলা দিতে পারে না। ইহাই আমার ধারণা,—বোধ করি ইহাই সত্য। যে কথা বলিতেছিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ জীবনে যেমন দেখাইয়াছেন সামান্য চাল চলনে থাকিলে বেশ সুখে থাকা যায়, চালচলনের আড়ম্বর বাড়াইলেই কষ্ট। যাঁহারা তাঁহার আচার ব্যবহার সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এ কথা ভাল বুঝিবেন। তিনি যে কেবল চটিযুতা ও থান চাদর পরিধান করিতেন তাহা নহে, বাকি আচার ব্যবহারেও তিনি ঠিক সেইরূপ করিতেন। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে চাহিতেন,থাকিতে ভাল বাসিতেন,তজ্জন্যসকলকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার সেই বসিবার ঘরটী একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি। চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুস্তকাধারে অসংখ্য-পুস্তক, সেই মোটামুটী অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টেবিল চেয়ার, কাষ্ঠ নির্ম্মিত কিন্তু কেমন পরিষ্কার। কয়েক খানি ছবি ও ছিল। এক এক খানি ছবির সহিত এক এক খানি ইতিহাসও ছিল। ছবি গুলি কাহার ? তাঁহার পরমহিতৈষী

কাপ্তেন মার্শেলের ও বেথুন সাহেবের, অপর ঘরে তাঁহার অপার স্নেহাধার জনক জননীর। সে বৈঠক খানায় কুশন চেয়ার, স্প্রিংয়ের গদী, বা বহুমূল্য সোফা ছিল না। কিন্তু তবু সেখানে সেই কাঠের চেয়ারে বসিয়া কত মহানুভব ব্যক্তি কত মহানন্দ লাভ করিতেন। আবার বলি বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মণ ছিলেন,—ভোগ বিলাস ব্রাহ্মণের লক্ষণ নয়। যে ব্যক্তি যত ভোগ বিলাস বাড়াইবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব হইতে তত তফাতে গিয়া পড়িবে। এখনকার এই দারুণ সময়ে উদরান্নের জন্য আমাদিগকে নানা সাজে নানা সময়ে সাজিয়া বেড়াইতে হয়। লোকে বলে ভেক না হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু ভেকটা যেন ভিক্ষার জন্যই হয়, সর্ব্বসময় স্থায়ী হয় না। যখন না হইলে নয় তখন যে সাজে সাজাইয়া পুতুল বাজীর পুতুলের মত আমাদের কার্য্যনিয়ন্তারা আমাদিগকে নাচাইতে চান আমরা যেন, তাহা ছাড়া অন্য সময়ে আর সে সাজে কখন সাজি না। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর দেবীচৌধুরাণীর

ন্যায় আমাদের ব্যবসাদারীর জন্য যতটুকু করিতে হয় সাজ পাঠ ঠিক যেন ততটুকুই থাকে। "রাণীগিরির ব্যবসাদারী" কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। তাহা হইলে কতকটা পরিত্রাণের উপায়। "রাণী গিরি" ভিতরে ঢুকিলেই আমরা মজিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুতুল বাজির সং সাজিতেন না। তিনি জীবন্ত মানুষ ছিলেন, আমাদের ন্যায় নির্জ্জীব পুত্তলিকাবৎ ছিলেন না। কতবার কত লোক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পুতুল সাজাইতে পারে নাই। সুতরাং তাঁহার পক্ষে ভিতর বাহির ছিল না। বাহিরটা যাহা ইহউক, ভিতরের চাল চলনটায় তাঁহার উপদেশের অনুসরণ করিতে পারিলে তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমরা সুখে থাকিতে পারি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আড়ম্বরশূন্য সামান্য বেশভূষা তাঁহার কিসের পরিচায়ক? সরলতার—না অহঙ্কারের? অনেকের এ কথা অনেক সময় মনে উঠিতে পারে, অন্ততঃ আমার একদিন এ দুর্ভাবনা হইয়াছিল। এক খানি

ইংরাজী সমালোচনা গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে একদা ভাষার সরলতা সম্বন্ধে পড়িয়াছিলাম যে, যে ভাষা লোকের একটু মাত্র মন আকর্ষণ করে না, মোটেই চক্ষে পড়ে না, লোকে পড়িয়াই ভাব গ্রহণ করে, ভাষার প্রতি লক্ষ্যমাত্র করে না, সেই ভাষাই খুব সরল। তাহা হইতে আমার অনেক কথা মনে আইসে। এই যে পাশ্চাত্য নিয়মানুকরণে আমাদের আজকাল সর্ব্বদাই সভা সমিতি হইতেছে। যখন দেখি-লাম শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা শুনিয়া বক্তাকে প্রশংসা করিলেন, ধন্যবাদ দিলেন, করতালির রোলে সভাস্থল আলোড়িত করিলেন, পথে ঘাটে ঘরে বাহিরে বলিতে লাগিলেন অমুক বাবু বা অমুক সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে, যখনই তাহা দেখি-লাম, যখনই তাহা শুনিলাম, তখনই ভাবিলাম বক্তৃতা কিছুই হয় নাই, বক্তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, বক্তা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, বক্তার ভাব কেহ গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে কেহ মজেন নাই, কারণ তাহা হইলে তাঁহার

বক্তৃতার কথা মনে থাকিত না, তাঁহার কথিত বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য হইত। যেখানে তাহা না হইল, সে থানে বক্তৃতার প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু বক্তার শ্রম নিষ্ফল হইল। উপরে ভাষা সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিলাম, বক্তৃতা সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, বেশভূষা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। যে থানে বেশভূষা, মানুষ ছাড়াইয়া উঠে, সে থানে বেশভূষারই প্রাধান্য থাকে; সেখানে বেশ-ভূষার প্রশংসা হইতে পারে কিন্তু যাহার সে বেশভূষা তাঁহার কি হইল? তিনি থাট হইয়া পড়িলেন। তা সে বেশভূষা খুব বহুমূল্যই হউক বা সে যৎসামান্যই হউক। মোট কথা, আমার বক্তব্য এই যে, যে যেমন লোক তাঁহার সেইরূপ বেশভূষাই ভাল; তাহাতে অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যতটা সামান্য করা যাইতে পারে তাহা করাই ভাল, তাহাকেই সরলতা বলে। তাহার অভাবের নাম অহঙ্কার বা অভিমান। বিদ্যা-সাগর মহাশয় এত বড় লোক ছিলেন, সামান্য চটী যুতা থান কাপড় কি তাঁহার উপযুক্ত

পোষাক,না তাঁহার সেটা অহঙ্কার বা অভিমান-সূচক? একথার এক মাত্র উত্তর—তিনি যত বড়ই লোক ছিলেন না কেন, তিনি ত বিদ্যা-সাগর বৈ আর কিছুই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক, করিতেনও অধ্যা-পনা। আচার ব্যবহারটাও ঠিক তাহাই ছিল। তাঁহার জীবনে কিছু লোভ লালসা ছিল না, যে তাহাতে তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত, তাঁহার কার্য্যাকার্য্যের সহিত, তাঁহার চটী যুতা থান চাদর সাজিত না। তিনি যদি বড় যুড়ী গাড়ীতে লিবারী যুক্ত ভৃত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত অষ্ট্রেলিয়া দেশজাত অশ্বদ্বয় যুক্ত মহামূল্যযানা-ভ্যন্তরে আসীন হইয়া চটী যুতা ও থান চাদর ব্যবহার করিতেন, তিনি যদি লাট মহালাটের সভার সদস্য হইয়া বা তাহার প্রার্থী থাকিয়াও চটী যুতা ও থান চাদর ব্যবহার করিতেন, তিনি যদি বড় বড় রাজপুরুষদিগের প্রসাদা-কাঙ্ক্ষী বা প্রসাদ ভোগী হইয়াও চটী যুতা ও থান চাদর ব্যবহার করিতেন, তিনি যদি অর্থ সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গলার একজন গণ্যমান্য

জমীদার হইয়া নায়েব কারকুনে পরিবেষ্টিত কাছারি বাটীর মধ্যে সেই চটী যুতা ও থান চাদর ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে বরং তাঁহার অহঙ্কার বা অভিমানের কথা উঠিতে পারিত। তাঁহার বাকি আচার ব্যবহার থান চাদর ও চটী যুতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে, স্নুতরাং তাহাতে অভিমান বা অহ-ঙ্কারের কিছুমাত্র কথা নাই। স্বর্গীয় বিদ্যা-সাগর মহাশয় একজন প্রকৃত মনীষী ছিলেন। তাহার সে কথায় ভুল হইবার নহে। ভুল হয় আমাদের ন্যায় স্থূল বুদ্ধি লোকের। কখন মনে হয়, হয়ত খুব সরলতা দেখাইলেই লোকে ভাল বলিবে, আমাকে ভাল দেখাইবে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম রক্ষণ করে কে? আমি যাহা, তাহা অপেক্ষা একটু ছোট বড় সাজিতে গেলেই সাজ ধরা পড়ে, কাকের ময়ুর পুচ্ছ খসিয়া পড়ে। তাইবলি আমার সামান্য বিবেচনায় যিনি যেমন লোক তাঁহার তেমনি চলাই ভাল, জোর জবরদস্তি করিয়া বেশ ভূষার আড়ম্বরও যেমন দূষণীয়, জোর জবরদস্তি করিয়া বেশ

ভূষার খর্ব্বতা ও তেমনি নিন্দনীয়। লোক শিক্ষক, অধ্যাপকাগ্রগণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে নিজের জীবনে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রতিনিয়ত মনে রাখিয়া তদনুসারে নিজ নিজ জীবনের কার্য্যাকার্য্য, আপন আপন চালচলন, ঠিক করিয়া চলিতে পারিলেই আমাদের ও সুবিধা ও স্বচ্ছন্দ, তাঁহার ও উপদেশের ও উদাহরণের সফলতা হয়। তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু তিনি আমাদের যে শিক্ষক ছিলেন সেই শিক্ষকই আছেন। তাঁহার পুস্তকে প্রদত্ত শিক্ষার নূতন সংস্করণ হইতেছে বটে কিন্তু তিনি নিজ আচার ব্যবহারে, চালচলনে দৃষ্টান্ত দ্বারা নির্ব্বাক ভাষায় যে মহতী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহার আর নূতন সংস্করণ হইবে না সে শিক্ষা চির দিন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহার ভক্তগণকে প্রতিনিয়ত তাঁহার পদানুসরণে নিরত রাখিবে। ইহাই আমার একান্ত বাসনা ও বিনীত প্রার্থনা।

তৃতীয় কথা—একাগ্রতা-আত্মনির্ভরতা-স্বাধীনতা ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময় ভূমিষ্ঠ হন তাঁহার পিতা স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। বাটী ফিরিয়া আসিতেছেন, পথে তাঁহার পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ মহাশয় তাঁহার পিতাকে বলেন যে, তাহাদের বাড়ীতে একটী এঁড়ে বাছুর হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বাড়ীতে আসিয়া তাড়াতাড়ি গোশালায় দেখিতে যান, তাহাতে তাঁহার পিতা সদ্যোজাত শিশু বিদ্যাসাগরকে দেখাইয়া বলেন এই এঁড়ে বাছুরের কথা বলিতে ছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃষ রাশিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা পৌত্রের প্রতি ব্যঙ্গ করিবার মানসেই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহ ঠাকুর তাঁহাকে এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক জীবনী লেখক ও অপর অনেক লোক বলিয়া থাকেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিনই সেই

কথা ন. র্থক করিয়াছেন। তাঁহার এঁড়ের গোঁ চিরকালই সমান ছিল। আমি কিন্তু তাহা বলি না, আমার সে মত নহে। এঁড়ের গো. বলিতে যে হিতাহিতবিবেচনাশূন্যতা বুঝায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ে তাহা আরোপ করিতে সাহসও হয় না. ইচ্ছাও হয় না, এবং তাহা নয় বলিয়াই আমার ধারণা। তাঁহার অধ্যবসায়, কার্য্যে একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা, বাঙ্গালিদুর্লভ-স্বাধীনতা এত বেশি পরিমাণে ছিল যে, সহজে অনেক সময় অনেক লোক তাঁহাকে বড় একগুঁয়ে বলিয়া মনে করিতেন, এখনও করেন। মোট কথা তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তদনুসারে কার্য্য করিতেন, তাহাতে কেহই তাঁহাকে কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিত না, কিছুতেই গন্তব্য পথ হইতে হটাইতে পারিত না. তিনি অচল অটল ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেন, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, সহস্র বিপদ এড়াইয়া কৃতকার্য্যও হইতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ধারণা ভ্রমাত্মক,এ কথা বুঝাইতে

পারিলে যে তিনি বুঝিতেন না, এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার একাগ্রতার কথা অনেকেই জানেন, আমি এস্থলে দুই একটা কথামাত্র বলিব। তাঁহার এক সহোদরের বিবাহ কালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করিতেন। বীর সিংহের বাটীতে বিবাহ। তথায় তাঁহার মাতা ও সহোদরগণ আছেন, তিনি সকলের বড়। বিবাহ কার্য্যে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক। বিশেষতঃ তিনি না উপস্থিত থাকিলে তাঁহার মাতা মনোকষ্ট পাইবেন-- তিনি এই সকল ভাবিয়া কলেজের অধ্যক্ষকে যথাসময়ে ছুটীর জন্য আবেদন করিলেন। ভ্রাতার বিবাহে ছুটীর আবশ্যকতা সাহেব বুঝিবেন কেন? সাহেব ছুটী দিলেন না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুণ্ণ মনে বিষণ্ণ ভাবে বাসায় ফিরিলেন। তৎপরে তিনি সমস্ত রাত্রি সেই ভাবনা ভাবিয়াছেন ও কাঁদিয়াছেন। এ কান্না বাটী প্রিয় লোকের বাটী যাওয়া হইল না বলিয়া কান্না নয়, স্ত্রীপুত্র

প্রাণ গৃহস্থের স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়ার কান্না নয়। এ কান্না মাতা ও ভ্রাতার মনোকষ্ট হইবে, তাহা ভাবিয়া—নিজের কর্ত্তব্য সাধন হইবে না, তাহা ভাবিয়া। এ অন্তরের বড় পবিত্র কান্না, এ কান্না ভগবান শুনেন। পর দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজে গিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন, আপনি আমাকে অবকাশ দিন; যদি না দেন তাহা হইলে এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম। ইহাতে সাহেব চকিত হইলেন, ব্যাপারটা কি? বিদ্যাসাগর তিন চারি দিন ছুটীর জন্য কার্য্য ত্যাগ করেন। অগত্যা সাহেব ছুটী মঞ্জুর করিলেন। যেমন ছুটী মঞ্জুর হওয়া অমনি সেই পথে সোজা বাটী যাত্রা। পথ অনেক, কিন্তু ক্ষমতা ততোধিক। ক্রমাগত দ্রুতপদে চলিলেন। একে বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাহাতে দ্রুতপদে, যাঁহারা তাঁহার গতি জানিতেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এ গতি সহজ নহে। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া দামোদরের কুলে যখন উপনীত হইলেন, তখন

দেখেন এবার বড় সঙ্কট,—দামোদরে বন্যা আসিয়াছে। পারের উপায় একমাত্র নৌকা তাহা অপর পারে। নৌকা আসিয়া লইয়া গেলে সময়ে বাটী পৌছান হয় না, মাতার দুঃখের উপশম হয় না। তখন মাতার চরণ স্মরণ করিয়া কুলপ্লাবী, খরস্রোত, ভীষণ দামোদর বক্ষে আত্মসমর্পণ করিলেন, সন্তরণ দ্বারা পার হইবার সঙ্কল্প করিলেন। তীরে যাহারা বসিয়া পারের ভাবনা ভাবিতে ছিল তাহারা পাগল ভাবিয়া প্রথমে নিবারণ করিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, আপনার মনে সন্তরণ করিয়া দামোদর অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিলেন। এটা কি বলিবেন—নিতান্ত একগুঁয়েমি না? আমাদের দেশে ইহা একগুঁয়েমি, গোঁয়ারতামি আর যাহার যাহা বলিতে হয় সমস্তই, কিন্তু দেশান্তরে বা সময়ান্তরে হইলে, ইহাই বীরোচিত একাগ্রতা, পুরুষোচিত আত্মনির্ভরতাদি নানারূপে প্রশংসিত হইত। এরূপ অসীম

সাহসিকতার কার্য্য নিজ কর্ত্তব্য বোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কত যে করিতেন তাহা সমস্ত বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। এই প্রকার ব্যবহারের ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে যে উদ্দেশ্যে সেই প্রকার অমানুষিক ব্যবহার করা হয়, অসাধারণ উপায় অবলম্বন করা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক তাহারই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি মাতা ও ভ্রাতার মনোকষ্ট নিবারণ মানসে এই অসাম সাহসিকতার কার্য্য না করিয়া কোন অপকৃষ্ট স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে, একগুঁয়ে বলিতে হয়, গোঁয়ার বলিতে হয়, যাহা বলিতে হয় বলুন তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সৎ, পবিত্র, মহৎ এবং তাঁহার কৃতকার্য্য সেইরূপ উদ্দেশ্যের সাধনোপায় সুতরাং তাহাও কখন গোঁয়ারতামি একগুঁয়েমি প্রভৃতি কলঙ্কিত আখ্যারযোগ্য নহে।

অপর একটা একগুঁয়েমির কথা বলি। যে সময় তাঁহার মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ে

সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকা না থাকা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন তাঁহার জনৈক সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত একত্র বসিয়া গল্প গুজব করিতেছেন। আমিও নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম। এমত সময় তাঁহার সেই বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন "বিদ্যাসাগর, তুমি ভাল বুঝিতেছ না, সুরেন্দ্রকে ছেলেরা বড় ভালবাসে, সে ছাড়িলে তোমার কলেজের বড় ক্ষতি হইবে।" এইটুকু বলিতে না বলিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলিয়া উঠিলেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন যে তাহা হইলে তিনি যে সন্দেহ করিতে ছিলেন আর তাহা রহিল না, সুরেন্দ্র বাবুকে ছাড়ানই তখনই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। তিনি বলিলেন তবে কি আমার কলেজ সুরেন্দ্রের উপর নির্ভর করে আমার তাহা দেখা চাই, তাহা হইলে সে কলেজ আমার না রাখাই ভাল।" যেমন প্রতিজ্ঞা তেমনি কাজ। ফলে সুরেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহার কলেজের সম্পর্ক তিরোহিত হইল। এটা কি একগুঁয়েমি,

না আত্মনির্ভরতা ? আমরা অবশ্য বড় বুদ্ধিমান এতটা একগুঁয়েমি বড় ভালবাসি না, কিন্তু যিনি পরের মুখাপেক্ষী হইয়া রাজসিংহাসন ভোগ করা অপেক্ষা আত্মনির্ভরতা সহকারে কুটীরবাসও শ্রেয়স্কর মনে করেন, যিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন অপেক্ষা মুষ্টিভিক্ষা শ্রেয়স্কর মনে করিয়া ছিলেন, সেরূপ মনীষীর কথা স্বতন্ত্র। সেটা একালের ন্যায় ক্ষীণবীর্য্য লোকের পক্ষে ভাল লাগিবে কেন ?

বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যায় রূপে আপনার মত সমর্থনের কদাপি চেষ্টা করিতেন না, সেটা তাঁহার বিচার বিতর্কে অনেক বুঝা যায়। তিনি কি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে, কি অপর কোন বিষয়ে যার তার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন, সকলকে তাঁহার মত বুঝাইতেন, সকলের মত বুঝিতেন, বুঝিয়া চলিতেন। তাহাতে কাহারও প্রতি অবজ্ঞা ছিল না, নিজের অভিমান ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে মোটেই একগুঁয়ে ছিলেন না, তাহার দৃষ্টান্ত সামান্য বিষয়ে এক দিন স্বয়ং পাইয়াছি। একদা

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই জোড়া শাল ক্রয় করা দরকার হয়, বলা বাহুল্য নিজের ব্যবহার জন্য নহে। শাল কিনিতে হইবে তজ্জন্য তিনি উপযুক্ত পাত্রে ভার দিলেন, তাঁহার পরম প্রিয় ছাত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দুই জোড়া শাল আনিতে বলেন। এক দিন অপরাহ্ণে বসিয়াআছেন এমন সময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় চারি পাঁচ জোড়া শাল লইয়া গিয়া বলেন ইহার ভিতর দুই জোড়া পছন্দ করিয়া লউন। সেখানে আমিও ছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে পছন্দ করিতে অনুমতি করিলেন। আমি যে দুই জোড়া পছন্দ করিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিয়া বলিলেন তাঁহারও তাহাই পছন্দ.কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন তদপেক্ষা অপর দুই জোড়া ভাল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পছন্দ করা জোড়া দুইটী পৃথক করিয়া রাখিয়া বাকি ফেরত দিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ফেরত লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি কিছু আশ্চর্য্যা-

ন্বিত হইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক কথায় নিজের পছন্দ ত্যাগ করিয়া অপর ব্যক্তির পছন্দ অনুমোদন করিলেন, এটা যেন একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল। আমি কথা পাড়িলাম তিনি উত্তর করিলেন "আমি ত পাগল হইনাই যে নীলাম্বরের সহিত শালের বিচার করিব।" আমি ইতি পূর্ব্বে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে চিনিতাম না, কখন দেখি নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরিচয় পাইলাম। বুঝিলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যায় তর্ক করেন না। এমন লোককে এক-গুঁয়ে বলাটা অন্যায় অভিযোগ নয় কি? আমি বলি না, আর যিনি যাহা বলিতে হয় বলুন। যিনি কার্য্যশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তাঁহারই এরূপ একাগ্রতা, আত্মনির্ভরতা সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর।

চতুর্থকথা—আত্মমর্য্যাদা-মান-সম্ভ্রম।

পাঁচজন একত্র সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে সকলেই যে এক রকমের লোক

হইবে এমন কখন হয় না। নানা কারণে পরস্পর পার্থক্য থাকে, সেই পার্থক্য বশত মর্য্যাদার বিভিন্নতা হইয়া থাকে, সেই মর্যাদা রক্ষা করা সমাজবন্ধনের মূলগ্রন্থি। তাহা নিজের জন্য নহে, তাহা সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, সকলের সুবিধার জন্য। যাহারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাসকরে তাহাদেরই এই নিয়ম। এমন কি অনেক নিম্ন শ্রেণীর জীবের ভিতরও এই মর্য্যাদার তারতম্য লক্ষিত হয়। পিপীলিকা মধুমক্ষিকাদের ভিতর সর্ব্বদাই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অসভ্য মানবের ভিতর যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের ভিতরও এই মর্য্যাদা রক্ষার লক্ষণ লক্ষিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই মর্য্যাদা রক্ষা করা সামাজিক লোকের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহাতে যাহার মর্য্যাদা করিতে হয় তাঁহার উপকার নহে সমগ্র সমাজের উপকার। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মান মর্য্যাদা বড়ভাল বুঝিতেন, তাহাতে সময়ে সময়ে তাঁহাকে অনেক দায়ে ঠেকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার

বৃথাভিমান ছিলনা, সুতরাং সে সকল দায় তিনি অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার মর্য্যাদাহানি হইয়াছে বুঝিতে পারিতেন তাহার প্রতিকার তিনি নিশ্চয়ই করিতেন। এখানে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন তিনি সংস্কৃতকলেজের সহকারী সম্পাদক তখন একদিন কোন কার্য্যসূত্রে তদানীন্তন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব একটী চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পদদ্বয় উত্তোলিত করিয়া একখানি পুস্তকাধ্যায়নে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যথা বিহিত অভিবাদন করায় সাহেব প্রত্যভিবাদন করিলেন না, পরন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা বলিবার জন্য গিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব পুস্তকার্পিত নয়নে জবাব দিলেন। সাহেবের এই অভদ্রোচিত ব্যবহারে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অপমানিত জ্ঞান করিলেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সুযোগ অনুসন্ধানে রহিলেন। কিছু

কাল পরে এক দিন দেখেন কার সাহেব সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে আসিতেছেন, অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাড়াতাড়ি লাইব্রেরীর একখানি চেয়ারে বসিয়া টেবিলে চটী সুশোভিত পদযুগল সমুত্থিত করিয়া যেমন ভাবে কার সাহেবকে একদিন বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন সেই ভাবে পুস্তক হস্তে বসিয়া রহিলেন। কার সাহেব গৃহের দ্বার দেশ পর্য্যন্ত আসিয়া দেখিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রাহ্য করিলেন না, অগত্যা সাহেব অমর্য্যাদার ভয়ে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার সে দিন সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করা হইল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ন্যায় কার সাহেব এই খানেই থামিলেন না। তিনি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ৺রসময় দত্ত মহাশয়কে বলিলেন, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ দিগকে জানাইলেন, একটা হুলুস্থুল করিয়া ফেলিলেন। এই সম্বন্ধে উক্ত দত্ত মহাশয় একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর

মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন "কার সাহেব একজন বিলাতী শিক্ষক, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তাঁহার নিকট হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারা যে সদাচার শিক্ষা পাইয়াছি আমি ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়াছি, তবে তফাতের মধ্যে সাহেবের পায়ে ছিল বিলাতি বুট আর আমার পায়ে তালতলার চটী। সেই যা পৃথক।" কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৈফিয়ত তলব করেন তাহাতে তিনি উপরিউক্ত মর্ম্মেই জবাব দেন। উক্ত দত্তজ মহাশয় যখন এই ব্যাপার লইয়া বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বলিলেন "আমি চাকরি গ্রাহ্য করি না, আমার চাকরি যায় তাহাতে আমার ভয়ও নাই, ভবনাও নাই, আমি বামুনের ছেলে আমার ভাবনা কি? ভাবনা আপনাদের আপনারা ভাবুন।" দত্তজ মহাশয় দেখিলেন এ বড় সহজ বামুনের ছেলেনয়, চাকরি গ্রাহ্য করে না, উপরওয়ালাকে অণুমাত্র ভয় করে না, পয়সার মায়া করে না, মর্য্যাদা

হানি সহিতে পারে না। কাজেই চুপ করিয়া রহিলেন। কর্ত্তৃপক্ষগণও থামিয়া গেলেন।

আর একদিনের কথা বলি। লর্ড ডফরিণ যখন বড় লাট সেই সময় এক দিন আমাদের দেশের কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কে কে গিয়াছিলেন নামের প্রয়োজন নাই, অনেকেরই স্মরণ আছে অধিক দিনের কথা নহে। এই সময়ে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েক জনের বিলাতী পরিচ্ছদ দেখিয়া বড় লাট ডফরিণ বিরক্ত হইয়া অনেক তিরস্কার করেন। মান খুঁজিতে গিয়া মুখের উপর ইঁহারা এইরূপ তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। সহরময় মহা গোলযোগ। সর্ব্বত্রই সেই কথার আন্দোলন, আলোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমে এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যে কথা বলিলেন ঠিক্ সে কথা বলার আবশ্যক নাই, যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, "ইহারা যায় কেন? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যাওয়াই

বা কেন, অপমান বোধ করাই বা কেন?" এই উপলক্ষে নিজ জীবনের এক দিনের গল্প বলিয়াছিলেন। হালিডে সাহেব যখন ছোট লাট, তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন প্রতি সপ্তাহে এক দিন করিয়া তিনি সকলের সহিত সাক্ষাত করিবেন। এই সাধারণ সাক্ষাতের দিন ছোট বড় কত লোকই তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সাধারণ সাক্ষাতের দিনেই এক দিবস হালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আহ্বান করিয়া পাঠান। শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরামর্শ জন্ত হালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আহ্বান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, অপেক্ষা করিবার বৃহৎ-ঘরে লোকে লোকারণ্য, কত রাজা মহারাজা, কত বিদ্বান বুদ্ধিমান, কত ধনী মানী লোক সমবেত। উহারি ভিতর আবার দুইদল হইয়া বসিয়া আছেন। একদিকে বনিয়াদি ধনীর দল, অপর দিকে অন্যলোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইয়া একটু গোলে পড়িলেন। সকলেই

তাঁহার পরিচিত। তিনি কোথায় বসেন। ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া গরিবের দলেই বসিলেন। অমনি অপর দলের একজন আসিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে লইয়া বসাইলেন। বসিয়া তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-লেন, তাঁহারা কখন আসিয়াছেন। কেহ বলি-লেন একঘণ্টা,কেহ দুই ঘণ্টা, কেহ তিন ঘণ্টা, কেহ বা বলিলেন গত সপ্তাহ বসিয়া বসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিলেন দুই সপ্তাহ আসিয়া ফিরিয়াছেন। কেহ তিন সপ্তাহ। এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে বিদ্যা-সাগর মহাশয় নিজ আগমন বার্ত্তা কাগজে লিখিয়া চাপরাশী দ্বারা সাহেবের গোচরে আনিলেন। অমনি হালিডেসাহেব চাপরাশী দ্বারা তাঁহাকে সেলাম দিলেন। চাপরাশী আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "লাট সাহেব সেলাম দিয়া।" যে ব্যক্তি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে ছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি সহরের একজন তদানীন্তন অনেক সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোক, তাঁহার

নাম করিব না। তিনি মনে করিলেন তাঁহা-কেই লাট সাহেব ডাকিয়াছেন; উঠিতেছেন অমনি চাপরাশী বলিল "আপকো নাহি, পণ্ডিত সাহেবকো।" ভদ্রলোকটী বড়ই অপ্রতিভ হই-লেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুণ্নমনে লাট সদনে গিয়াই প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এই সকল আমাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত লোককে এত কষ্ট দেন কেন?" তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল। হালিডে সাহেব বলিলেন "ইহারা আসে কেন? আমি ইহাদিগকে ডাকিতে যাই নাই। ইহারা যদি পাঁচদিন সাক্ষাত না করিতে পাইয়া ফিরিয়া যায় আবার ষষ্ঠ দিবস আসিবে। কিন্তু আপনাকে যদি আর পাঁচ মিনিট দেরি করাইতাম তাহা হইলেই বোধ করি আপনি ফিরিয়া যাইতেন, আর ডাকিলে আসিতেন না, এই তফাৎ।" তাই ডফরিণ সাহেবের নিকট অপমানিত লোকদের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন "ইহারা যায় কেন?" ইহা সাহেবদেরই কথা। আপনার মান

আপনার ঠাঁই। মান রাখিতে না জানিলেই অপমানিত হইতে হয়। প্রসঙ্গচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাননীয় ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয়ের একটী গল্প সর্ব্বদাই বলিতেন। স্বর্গীয় শম্ভুনাথ বাবু একদিন হাইকোর্টের একজন জজ সাহেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় চাপরাশী আসিয়া সাহেবের হাতে এক খানি কার্ড দিল। সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অভদ্রোচিত গালিগালাজ করিয়া চাপরাশিকে বলিলেন "বোলোযাকে ফুরশুৎ নাহি হায়।" চাপরাশী সাহেবের মেজাজ জানিত, সেকথা আগন্তুককে না বলিয়া সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণ কালপরে সাহেবের নজর পড়িল, সাহেব বিরক্তি সহকারে বলিলেন "আনে বোলো"। চাপরাশী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া আগন্তুককে ঘরে প্রবেশ করাইতে না করাইতে সাহেব স্বয়ং দ্রুতপদে গিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, দুই হাতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া নিজাসনের একাংশে উপবেশন করাইলেন। তখন স্বর্গীয় শম্ভুনাথ বাবু দেখিলেন আগন্তুক অপর কেহ

নহেন, তাঁহারই বন্ধু সদর দাওয়ানি আদালতের প্রধান উকিল মুনসি আমির আলি সাহেব। শম্ভুনাথ বাবু বিদায় হইলেন। বিদায় কালে শুনিতে লাগিলেন জজ সাহেব মুন্‌সি মহাশয়ের নিজের ও বাটীর পরিজন বর্গের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যিনি একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া অসাক্ষাতে অভদ্রোচিত গালি গালাজ করিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাতে এত আপ্যায়িত করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে পণ্ডিত মহোদয় বিদায় হইলেন। সেই অবধি শম্ভুনাথ বাবু নাকি আর কখন কোন সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবদের সহিত সাক্ষাত করিবার কথা উঠি-লেই এই গল্পটী করিতেন। যাঁহার নিজ মর্য্যাদা রক্ষাকরা আবশ্যক তিনি কেন এইরূপে অপমানিত হইতে যাইবেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন "ইহারা যায় কেন?" "ইহারা যায় কেন" একথা লোভলালসাহীন, সাংসারিক-দুরাশা-বিহীন বিদ্যাসাগর মহাশয়

বুঝিবেন কেন? সে কথা আমরা বুঝি। তাহাতেই আমরা মজি। আমাদের অভাব কিছুতেই ঘুচে না,আশার কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। তাই পাগলের মত ছুটাছুটী করিয়া মান অভি-মানে বিসর্জ্জন দিয়া আপনারাও অধঃপাতে যাই, দেশকেও অধঃপাতে লইয়া যাই। কবে আমরা বুঝিব মান এমন করিয়া হয় না, মান খুঁজিলে মান পাওয়া যায় না, মানের জন্য মাথা খোঁড়া খুড়ি করিলে মান পাওয়া যায় না। মান রাজদরবারে নাই, বিচারালয়ে নাই, সহরে নাই, জঙ্গলে নাই। মান সম্ভ্রম সমস্তই নিজের কাছে। নিজের গুণের জন্য মান হয়, নিজের চরিত্র জন্য মান হয়। যেখানে মান হইবার সেখানে আপনা হইতেই হয়,মানুষে চেষ্টা করিলে হয় না। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর দুই একটী কথা বলি। বড় লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাত করিতে যাইবার জন্য বিশেষ সম্মানিত লোকদিগকে একটি পৃথক পথে যাইবার (Priv-ate entryর) ব্যবস্থা আছে। এই অধিকার খুব কম লোকের অদৃষ্টে ঘটে। বড় বড় রাজামহা-

রাজাদেরও আকাঙ্ক্ষণীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার জন্য কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, অথচ তাঁহার নাম সেই সম্মানিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে একটা বড় গোলযোগ। যখনই একটা কিছু দরবার হইবে তখনই উপস্থিত হইতে হইবে, তাহাতে আবার চটীজুতা থানকাপড় চলিবে না। তাঁহার বড় ভাবনা হইল। তিনি ভাবিতে ভাবিতে একদিন বড়লাট বাহাদুরের প্রাইবেট সেক্রে-টারির আপিসে যেখানে সেই তালিকা প্রস্তুত ও রক্ষিত হয় তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন-কার প্রাইবেট সেক্রেটারী তাঁহার জনৈক বন্ধু সাহেব; যাইয়া সাহেবকে বলিলেন যে প্রাইবেট এণ্ট্রির ফর্দ্দটা দেখিবেন। সাহেব মনে করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম তালিকা ভুক্ত দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন, আবার হয় ত আর কাহারও জন্য অনুরোধ করিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তালিকাটী হস্তে লইয়া সাহেবকে তাঁহার একটি অনুরোধ রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুত করিয়া লইলেন। তালিকাটি হাতে

লইয়াই নিজের নামটি কাটিয়া দিলেন। সাহেবকে, বলিলেন "আমার অনুরোধ আপনি রাগ করিবেন না। আপনি অনুরোধ রক্ষা করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আর সাহেবলোক একবার প্রতিশ্রুত হইলে তাহা কোন মতে প্রত্যাহার করেন না। কাজেই আমাকে আর কিছু বলিবেন না।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম কাটা হইয়া গেল। অপর একটী কথা। যখন পণ্ডিতগণের সম্মানার্থ মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি হয়, তখন জনৈক সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত উপাধি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক কি না জানিতে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি বিনীত ভাবে, মহাত্মার উপযুক্ত নম্রতার সহিত বলিলেন "এত বড় উপাধির কি আমি যোগ্য ?" বাস্তবিকই তাঁহার ধারণা যে তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দিলে উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা হইবে না। তিনি রাজি হইলেন না। তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হইল না। তাহাতে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন।

উপাধি সম্বন্ধে অপর একটী গল্প বলি। সকলেই জানেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে C, I. E. উপাধি প্রদান করেন। সে বার বোধ করি অগ্রে তাঁহার মত লওয়া হয় নাই, কারণ তাহা হইলে তিনি কখন তাহাতে সম্মত হইতেন না। রাজা উপাধি দিয়াছেন, ইচ্ছুক হউন, অনিচ্ছুক হউন, উপাধি গ্রহণ করিতেই হইল। কিন্তু উপাধি গ্রহণ সম্বন্ধে তাঁহার একটা বড় গোলযোগ, রাজসদনে দরবারি পোষাকে গিয়া উপাধি লইতে হইবে। যথা সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার প্রিয় নিভৃত নিবাস কর্ম্মটাড় চলিয়া গেলেন। উপাধি দেওয়ার দরবার ফুরাইয়া যাইলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসার কিছু দিন পরে লাটসাহেবের দপ্তর খানা হইতে একজন বাঙ্গালি কর্ম্মচারী ও একজন চাপরাশী তাঁহাকে C. I. E. উপাধির পদক প্রদান করিতে যান। তাঁহারা

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত পদক অর্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাঁহাদের বিলম্ব করিবার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে তাঁহারা অনেক ধনী লোকের নিকট এইরূপ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মর্য্যাদাসূচক পদক লইয়া গিয়া যেরূপ পুরস্কার পান। তিনি অতি গরিব লোক তাঁহার নিকট সেরূপ প্রত্যাশা নাই। তিনি অনেক কষ্টে যাহা কিছু দিবেন তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না। এমত অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহা-শয় বলিলেন "আমি একটা কথা বলি তাহাতে আমারও সুবিধা তোমাদেরও সুবিধা হইবে।" তিনি বলিলেন যে উক্তব্যক্তিদ্বয় যে পদক আনিয়াছিলেন তাহা রৌপ্যনির্ম্মিত, তাঁহারা তাহা বাজারে কোন বেনের দোকানে বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাইবেন, তাহা দুই জনে ভাগ করিয়া লন, আর বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পূর্ণরূপে ইহাও প্রতিশ্রুত হইলেন, যে তিনি একথাকাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। রাজকর্ম্মচারী বাবু ও চাপরাশী অবাক্, এমত কথা তাহারা কখনও

শুনে নাই। ভাবিতে ও পারে না, যে উপাধি জন্য, যে পদক জন্য, আমাদের দেশের লোক কত চেষ্টা করেন, কত অর্থব্যয় করেন, রাজ-পুরুষদের কত উপাসনা করেন, কত লাঞ্ছনা ভোগ করেন, আর কত যে কি করেন, সে কথা না বলাই ভাল, এ হেন উপাধি সম্বন্ধে বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের এরূপ ঔদাস্য দেখিয়া কর্ম্মচারী-দ্বয় বিস্ময়াপন্ন। তাহারা ত সামান্য কর্ম্মচারী, অনেক বুদ্ধিমান, বিজ্ঞলোকেও বিস্ময়াপন্ন হই-বেন। একালে ইহা বড় একটা সহজ কথা নহে। তবে সেকথা লোক বুঝিয়া। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও একালের একটা সহজ লোক ছিলেন না। তিনি মর্য্যাদার জন্য, সম্মানের জন্য প্রয়াসী ও প্রত্যাশী হইবেন কেন? তিনি নিজ গুণে, নিজ চরিত্র বলে, নিজ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, নিজ অসীম বিদ্যাবত্তায় রাজদ্বারে সম্মানিত, লোকের নিকট পূজিত, দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভগবান যাঁহাকে সম্মান দিয়াছেন তিনি মানুষের কাছে সম্মানের জন্য লালায়িত হইবেন কেন?

পঞ্চম কথা—দান।

ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনু বলিয়াছেন :—

তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দান মেকং কলৌযুগে॥

মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৮৬ শ্লোক।

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ধর্ম্ম ছিল,ত্রেতায় জ্ঞান প্রধান, দ্বাপরে যজ্ঞই প্রধান এবং কলিতে কেবল দানই প্রধান ধর্ম্ম।

অনন্ত প্রতিভা সম্পন্ন, তপঃপ্রভাবময়, ভবিষ্য তত্ত্বজ্ঞ ভগবান মনু বুঝিয়াছিলেন কলিতে হিন্দুর এত কষ্ট, এত অভাব হইবে। সেই জন্য তিনি তাহার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় দানের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকৃত হিন্দুর দান সময়াসময়ের উপর নির্ভর করে না, স্থলাস্থল সাপেক্ষ নহে, পাত্রাপাত্রদর্শী নহে। দানের প্রার্থী পাইলেই দান করিতে হইবে। ব্যবহারশাস্ত্রের প্রণেতাগণ যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সহস্র অপরাধী অপরাধ সত্ত্বে শাস্তি ভোগ না করে তাহাও ভাল, কিন্তু

যেন একজন নিরপরাধ ব্যক্তি অন্যায় শাস্তি-গ্রস্ত না হয়, তেমনি ধর্ম্মজ্ঞানী প্রকৃত হিন্দুর ইচ্ছা সহস্র অপাত্রে দান করিতে হয় তাহাও ভাল, তবুও যেন একজন উপযুক্ত পাত্র দানে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দান না করিয়া আমাদের চারা নাই। এতৎ সম্বন্ধে মহাভারতের একটী অতি মহৎ উপদেশ পূর্ণ গল্প আছে। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞের পর মহারাজ ধার্ম্মিক প্রবর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের মনে মনে অভিমান হইয়াছিল যে তাঁহার মত দাতা পৃথিবীতে আর কেহ নাই। পৃথিবী জুড়িয়া তাঁহার দাতৃত্বের খ্যাতি বিকীর্ণ হইয়াছে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের এই প্রকার অহঙ্কার বুদ্ধির উদয় হয়। ভগবান অন্তর্য্যামী দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিলেন এবং পাণ্ডব শ্রেষ্ঠের দর্প বিনাশ করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত দান কাহাকে বলে ও প্রকৃত দাতা কে তাহা বুঝা-ইবার জন্ম মানস করিলেন। ভগবান ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক যৎকালে যুধিষ্ঠির অশুচি

অবস্থায় আছেন এমত সময় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া জানাইলেন যে তিনি ভিক্ষার্থী, তাঁহাকে অবিলম্বে তাঁহার প্রার্থিত ভিক্ষা দিতে হইবে, তাঁহার অণুমাত্র বিলম্ব সহে না। যুধিষ্ঠির সদা সদাচার রত, তিনি দেখিলেন অশুচি অবস্থায় দান শাস্ত্রসঙ্গত নহে, তাহাতে তাঁহার মন কুণ্ঠিত হইল, ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মণ, ক্ষণকাল বিলম্ব করুন, আমি শুচী হইয়া আপনার প্রার্থনা পূরণ করিতেছি। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ তথা হইতে চলিয়া গিয়া তৎ-ক্ষণাৎ কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে যেরূপ বলিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ বলিলেন। কর্ণও তখন যুধিষ্ঠিরের ন্যায় অশুচি অব-স্থায় ছিলেন, কিন্তু কর্ণ নিজ অবস্থার কথা এক কালে বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা অবিলম্বে পূরণ করিলেন। মহারাজা যুধিষ্ঠির বড়ই ক্ষুন্ন হইলেন, তিনি এত বড় রাজাধিরাজ, তাহার উপর ধর্ম্মরাজ, ধার্ম্মিক প্রবর, তিনি দানে মানে আচারে ব্যবহারে ধর্ম্মে কর্ম্মে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা, অথচ একজন ভিক্ষুকের

প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন নাই, কাজেই বড়ই ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। ভগবান বাসুদেব এতদবস্থাপন্ন পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া তাঁহার চিন্তার ও বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধিষ্ঠির আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিয়া বিস্তর খেদ প্রকাশ করিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা জন্য বলিলেন, মহারাজ ব্রাহ্মণের জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না, ব্রাহ্মণের অভাব তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হইয়াছে। আপনার নিকট ভগ্নমনোরথ হইয়া ব্রাহ্মণ সূতপুত্র, কৌরবাশ্রিত, কর্ণের নিকট গিয়া আপনার অভাব জ্ঞাপন করেন। কর্ণও তখন আপনার ন্যায় অশুচি অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা না মানিয়া তদবস্থাগত হইয়াও ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ দান করিয়াছেন। কর্ণ, সূতপুত্র, আচার ব্যবহারে সুশিক্ষিত নন, অশুচি অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন। তাহাতে কর্ণের দানের ফল হয় নাই সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণের অভাব দূর হইয়াছে। তজ্জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। অসীম ধীশক্তি-

সম্পন্ন নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সকলই বুঝিলেন। কে ব্রাহ্মণ, কি জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন সমস্তই বুঝিলেন। বুঝিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন, বলিলেন দর্পহারী শ্রীমধুসূদন, বাস্তবিকই আমার বড় অহঙ্কার হইয়াছিল তাহার উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছি। যুধিষ্ঠির শিক্ষা পান আর নাই পান, এই উপাখ্যান হইতে আমরা যথেষ্ট শিক্ষা পাইতেছি। যিনি প্রকৃত দানধর্ম্মে দীক্ষিত তিনি অবস্থা দেখিবেন না, কালাকাল দেখিবেন না, পাত্রাপাত্র দেখিবেন না, ফলাফল দেখিবেন না। দান করাতেই তাঁহার প্রীতি, তাহাতে আর কিছু স্বার্থ চাহেন না। দান সম্বন্ধে আমার এত কথা বলিবার কারণ আর কিছু নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ ভাবে দান করিতেন তাহা জগদ্বিখ্যাত। তিনি কখন কালাকাল, পাত্রাপাত্র, অবস্থা বা ফলাফল বিবেচনা করিতেন না। তজ্জন্য তাঁহার জীবদ্দশায় অনেকে তাঁহাকে অনেক দোষ দিতেন, তাঁহার পরলোক গমনের পর অনেকে অনেকরূপে সমালোচনা করিয়া

থাকেন। কিন্তু আমার মতে তিনি যে ভাবে দান করিতেন সেই ঠিক হিন্দুর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালিত, হিন্দুপ্রকৃতিগত ব্যবহার। ইহার উপর তাঁহার দানের অপর একটী মহৎ গুণ ছিল। তিনি অতি গোপনে দান করিতেন। খৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান আছে, যে এক হস্ত যাহা দান করিবে অপর হস্ত তাহা যেন জানিতে না পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান ঠিক সেই ভাবের গোপনে দান ছিল। দুই একটী কথা বলি। একদা একটী বিপন্ন ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। শুনিলেন ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ঋণদায়ে জড়িত। উত্তমর্ণ কলিকাতার ছোট আদালতে নালিশ করিয়াছেন। গরিব ব্রাহ্মণ উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া চিন্তায় আকুল। তিনি একদিন পথে যাইতে যাইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, কিন্তু যাঁহার সহিত এত কথা কহিলেন তিনি যে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া

চুপ করিয়া রহিলেন। পর দিন ছোট আদালতে যাইয়া মকদ্দামার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন এবং দাবির সমস্ত টাকা মায় খরচা জমা করিয়া-দিলেন। মকদ্দামার দিন সকলেই অবাক্। উত্তমর্ণ অধমর্ণ উভয়েই বিস্মিত, কে টাকা জমা দিল। আদালতের বিচারাসনে আসীন হাকিম হইতে অর্থী প্রত্যর্থির শোণিত লোলুপ পেয়াদা পর্য্যন্ত কেহই জানিতে পারিল না, কে টাকা দিল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত। কিন্তু ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে। কালে সকলেই টের পাইলেন যে এই সাক্ষাত দয়াবতার, কারুণ্যের মূর্ত্তিমান্ দেবতা, বিপদাপন্নের একমাত্র সহায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গরিব ব্রাহ্মণকে এই দুস্তর ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই একটা ঘটনার কথা বলিলাম মাত্র। তাঁহার দানের দৃষ্টান্ত না দেওয়াই ভাল, কারণ তাঁহার নিকট, তাঁহার স্মৃতির নিকট, তাঁহার আত্মীয় গণের নিকট,তাহার ভক্তগণের নিকট অপরাধী হইতে হইবে। ভক্ত ভগবানকে বলিয়াছিলেন, প্রভো, আমার তিনটী অপরাধ ক্ষমা কর।

প্রথমতঃ তুমি অনির্ব্বচনীয় অথচ বাক্য দ্বারা তোমার স্তব করিবার চেষ্টা করিয়াছি, দ্বিতীয়তঃ তুমি সর্ব্বস্থায়ী অথচ তীর্থ যাত্রাদি দ্বারা তোমাকে স্থানাবদ্ধ করিয়াছি, তৃতীয়তঃ তুমি অনন্ত অথচ তোমার রূপকল্পনা দ্বারা তোমাকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন্, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কর। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দানের দৃষ্টান্ত নির্দ্দেশ করিয়া সেইরূপ অপরাধে অপরাধী হইতে ইচ্ছুক নহি। সেদান অনন্ত, সর্ব্বস্থায়ী ও অনির্ব্বচনীয়; এবং পূর্ব্বে যে কথা বলিতে ছিলাম তিনি এক জনকে যাহা দান করিতেন অপর কেহ তাহা জানিতে পারিত না। তাঁহার একটী নিয়ম সর্ব্বদা দেখিয়াছি। তিনি দুইজনকে কখন এক সময়ে আসিতে বলিতেন না। কেহ একটার সময় আসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া গেল, কেহ দুইটার সময় পাঁচটী টাকা লইয়া গেল, কেহ তিনটার সময় আসিয়া একখানি শীত-বস্ত্র লইয়া গেল। সকলই তিনি ঠিক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। কাহার জন্য কি আনি-

তেছেন, কাহাকে কি দিতেছেন, কেহ জানিতে পারিত না। আবার সকলকে নিষেধ ও ছিল তাঁহার দানের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করা না হয়। তিনি প্রচার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সৎকর্ম্মের সৌরভ অনন্ত ব্যাপী। আপনার বাগানের কোন স্থানে একটী সুগন্ধ ফুল ফুটিয়াছে তাহাতে বাগান আমোদিত করিয়াছে। বায়ু গন্ধ ছড়াইয়া ফুলের সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। ফুল তাহা চাহেনা, কিন্তু বাতাস আপনার কার্য্য আপনি করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ কৃত সৎকার্য্য কেহ জানিতে পারে তাহা চাহিতেন না, কিন্তু কাল তাহা প্রচার করিয়াছে। এইত প্রকৃত দান, প্রকৃষ্ট দান, নিস্বার্থ দান, নিষ্কাম দান, দানের জন্য দান। ইহা রাজদরবারে জানাজানি হইল না, গেজেটে কাগজে ছাপাছাপি হইল না, লোকমুখে রটারটি হইল না। ইহাতে তিনি উপাধি পাইলেন না, ধন্যবাদ পাইলেন না, বাহবা পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার নাম বাহির হইল না, মান বাড়িল না। তাহাই কি সত্য? ইহাতে তিনি

যাহাকে দান করিলেন, তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ পাইলেন, হৃদয়ের মান পাইলেন, নিজে মনের সুখ পাইলেন, ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাইলেন। তাঁহার জন্ম সার্থক হইল। তিনি ধন্য হইলেন। আর আমরা কতবড় একটা প্রকৃত দানধর্ম্মের প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত পাইলাম। তাঁহার জীবনে মরণে আমরা যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, তৎসমস্ত চিন্তা করি আর মুগ্ধ হই। এ বিষয়ে আমরা যে কখন তাঁহার অনুকরণ করিতে পারিব সে আশা নাই। আমাদের না আছে তেমন আর্থিক ক্ষমতা, না আছে তেমন প্রকৃত শিক্ষা, না আছে তেমন মানসিক শক্তি, আর না আছে তেমন ধর্ম্মের জন্য প্রগাঢ় অনুরক্তি।

ষষ্ঠকথা—স্নেহ, ভালবাসা, মনুষ্যত্ব।

ভগবানের সৃষ্ট অপরাপর জীব জন্তুগণের অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ জীব। এই শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? ক্রমবিকাশ নিয়মানুসারে আপনা হইতে প্রাকৃ-

তিক নিয়মাধীনে মানুষ জন্মিয়াছে। মানুষে ও গবাদি জন্তুর ভিতর প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ আছে বৈ কি। সে প্রভেদ, সে পার্থক্য নানাবিধ। দৈহিক প্রভেদ, প্রকৃতিগত প্রভেদ, প্রবৃত্তিগত প্রভেদ। মানুষের কতকগুলি জিনিস আছে যাহা গবাদিতে নাই, আর এমত কতকগুলি আছে যাহা গবাদিতেও আছে। সেই প্রভেদ, সেই প্রবৃত্তি-গতও প্রকৃতিগত প্রভেদ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। গাভী বৎস প্রসব করিল যত দিন বৎস ছোট থাকিবে, স্তন্যপায়ী থাকিবে, তত দিন গাভীর বৎসের উপর বড় যত্ন, বড় স্নেহ, বড় ভালবাসা, একবার চক্ষের আড়াল হইলে হাম্বারবে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে দিবে, বৎসের গাত্রের ধুলা মাটী লেহন করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। আহা কত স্নেহ, কত যত্ন, কি চমৎকার "বাৎসল্য।" তারপর দিনকতক গত হইলে, বাছুর একটু বড় হইলে, নিজে খুঁটিয়া খাইতে শিখিলে, গাভীর আর সে ভাব থাকে না, আর বৎসের দিকে ফিরিয়া তাকায়

না, কালে কাছে আসিলে তাড়াইয়া দেয়। আপনার বৎস বলিয়া যেন চিনিতেও পারে না। এইত নিজ সন্তানের পক্ষে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি কৈ গাভীকে ত কখন কোন প্রকার স্নেহ মমতা দেখাইতে দেখা যায় না। মানুষ কিন্তু তাহা পারে না। ছেলে বড় হইলে ভাবনা একটু কমে বটে, কিন্তু স্নেহ মমতার পরিমাণ বাড়ে বৈ কমে না। যতই বয়স বাড়ে ভালবাসা ততই অধিক হয়। মানু-ষের সন্তানের প্রতি ভালবাসা অপর জীবের অপেক্ষা অনেক বেশী, অধিককাল স্থায়ী, বহু-দূর ব্যাপী। শুধু তাহাই নয়। মানুষ সন্তান ছাড়া আরও অনেককে ভালবাসে। মানুষ পিতা মাতাকে ভালবাসে, ভাই ভগি-নীকে ভাল বাসে, জ্ঞাতি বন্ধুকে ভাল বাসে, প্রতিবাসী স্বদেশ বাসীকে ভাল বাসে, মানুষ মানুষকে ভাল বাসে। মানুষ জীয়ন্ত মানুষকে ভাল বাসে, জীবমাত্রকেই ভালবাসে, মরা মানুষকেও ভালবাসে। আমি ইহাকেই মনুষ্যত্বের একটী প্রধান লক্ষণ

বলিতেছিলাম। এই ভালবাসা কোথাও প্রেম, কোথাও প্রীতি, কোথাও ভক্তি, কোথাও স্নেহ, কোথাও অনুরক্তি বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। জিনিসটা এক কেবল রকম ও নামের পার্থক্য মাত্র। সকলই সেই অন্তরের ভালবাসা। যাহার এই ভালবাসাটা যত অধিক, যাহার ভালবাসাটা যত অসীম, সে ব্যক্তি মনুষ্যত্বে তত উন্নত। ভালবাসা সম্বন্ধে আর একটা কথা। এটা প্রকৃত ভাল-বাসা হওয়া চাই। ভাল বাসার জন্য ভালবাসা হওয়া চাই। তাহা না হইলে সেটা ভালবাসাই নহে। যে ভালবাসার বিনিময়ে কোন পার্থিব লাভের আশা থাকে, যে ভালবাসার বদলে আর কিছু না হয় অন্ততঃ "প্রতিদানে প্রীতিদান" পাইবারও প্রত্যাশা থাকে, সেটা নিতান্ত ভালবাসার ব্যবসাদারি বলিয়া মনে হয়। সেটা ভালবাসা নহে। উহা অতি অপ-কৃষ্ট জিনিস। উহা স্বার্থপরতার বিকট রূপান্তর মাত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা

করিতে হইলে তাঁহার হৃদয়ের সেই অসীম, অনন্ত, দিগন্তব্যাপী ভালবাসার কথা না বলিলে কোন কথাই বলা হইল না। তাঁহার সে ভালবাসা বড় সহজ ভালবাসা নহে। সে ভালবাসার গভীরতা আমার কি সাধ্য স্থির করি। তিনি পিতা মাতাকে ভাল বাসিতেন, ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতেন, জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভাল বাসিতেন, স্বজন বান্ধবকে ভাল বাসিতেন, স্বদেশী বিদেশীকে ভাল বাসিতেন, পরিচিত অপরিচিতকে ভাল বাসিতেন, শত্রু মিত্রকে ভাল বাসিতেন। তিনি স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মীকে ভালবাসিতেন। তিনি গরিবকে ভালবাসিতেন, ধনীকে ভাল বাসিতেন, সভ্যকে ভালবাসিতেন অসভ্যকে ভাল বাসিতেন, পণ্ডিতকে ভাল বাসিতেন মূর্খকে ভাল বাসিতেন, বৃদ্ধকে ভালবাসিতেন বালককে ভাল বাসিতেন, পুণ্যাত্মাকে ভাল বাসিতেন পাপীকে ভালবাসিতেন। তাঁহাকে যিনি ভালবাসিতেন তাঁহাকে তিনি ভালবাসিতেন, যিনি গালি দিতেন তাঁহাকেও তিনি ভালবাসিতেন। যিনি ধন্ত-

বাদ দিতেন তাঁহাকেও তিনি ভালবাসিতেন, যিনি নিন্দা করিতেন তাঁহাকেও তিনি ভালবাসিতেন। তিনি ভালবাসিতেন না কাহাকে? সকলকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা, জীবমাত্রকে ভালবাসা, যেন তাহার জীবনের কার্য্য ছিল। তাঁহার জীবন যেন ভালবাসাময় ছিল। আর সে ভালবাসা, ভাষাভাষা নয়। পথে যাইতে যাইতে সাক্ষাৎ হইল আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, ভাল আছেন, আপনিও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ভাল আছেন, তারপর আপনাপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভালবাসা সে রকম নহে। তিনি শুনিলেন একজনের পীড়া হইয়াছে, অমনি তাঁহার প্রাণে বাজিল, হৃদয়তন্ত্রীতে ঘা লাগিল, রোগীর চিকিৎসায়, রোগীর সেবায় দেহ মন ঢালিয়া দিলেন। আপনার লোকে যাহা না পারে তাহা করিতে লাগিলেন। যে ভাল বাসে সেই আপনার লোক। তিনি রোগী মাত্রেরই আপনার লোক ছিলেন। সে বিষয়ে তাঁহার জাতি বিচার ছিল না, অবস্থা বিচার

ছিল না, সময় বিচার ছিল না। একজন মেথরের পত্নীর বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাইয়া সারাদিন রাতি রোগিণীর মলমূত্রময় কুটীরে বসিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করা, তাহার চিকিৎসা করা, তাহার পথ্যাপথ্যের আয়োজন করার কথা অনেকে জানেন। আর তাঁহার প্রিয় নিভৃতাবাস কর্ম্মটাড়ে সাঁওতালদের চিকিৎসা করা, কখন বা তাহাদের বাটী গিয়া কখন তাহাদিগকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিয়া কত যত্ন করিয়া তাহাদের আরোগ্য বিধান করিতেন, যেন তাহারা তাঁহার সন্তান। এই সকল সামান্য লোকদের তিনি এতই ভাল বাসিতেন। যাহাকে ভাল বাসিতে হইবে তাহার সহিত নিজের পার্থক্য বোধ থাকিলে, ছোট বড় জ্ঞান থাকিলে পুরা ভালবাসা হইবে না। সুখে দুঃখে যে ব্যক্তি ভালবাসে তাঁহার ভালবাসাই প্রকৃত। সুখের সময় অনেককে ভালবাসিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের সময়ই ভালবাসার পরীক্ষা। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়াছেন এমন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। দুঃখীকে এমন ভাল বাসিতে বুঝি আর কাহাকেও দেখিতে পাইব না!

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প করিয়াছিলেন তিনি কোন ধনী লোকের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বৈঠক খানায় বসিয়া গৃহস্বামীর সহিত গল্প গুজব করিতেছেন, এমন সময় তিনি শুনিতেপাইলেন সেই বৈঠক খানার নীচে একজন ভিক্ষুক অনেক ক্ষণ ভিক্ষার্থী হইয়া চিৎকার করিতেছে। ভিক্ষার্থির চিৎকার শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবেন। তিনি গৃহ-স্বামীকে বলিলেন, এই যে একটা লোক কতক্ষণ ধরিয়া চিৎকার করিতেছে ইহা কি তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে না। গৃহস্বামী মনে করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গল্পের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে বলিয়া ভিক্ষুকের চিৎকারে তিনি বিরক্ত হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ বাবুজী জলদ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—কৈ হায়? অমনি দুই চারিজন যমদূতের ন্যায় চাকর,

দ্বারবান বাবুজীর সম্মুখে উপস্থিত। হুকুম হইল ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দাও। দ্বারবান্ তাড়াইতে হুকুম পাইয়াছে সে ভিক্ষুককে আধ-মারা করিয়া গলা টিপিয়া দরজার বাহির করিয়া দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিলেন ইহাকেই বলে হিতে বিপরীত। গরিব না হয় খানিক ক্ষণ চিৎকার করিয়া, ভিক্ষা না পাইয়া, চলিয়া যাইত। আমার জন্য সে বেচারি আধমরা হইল। তাঁহার দেব হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। গৃহস্বামী বলিলেন "যান কোথায়?" বিদ্যা-সাগর মহাশয় "আসিতেছি" বলিয়া বাটীর বাহির হইয়া সেই ভিক্ষুককে অন্বেষণ করিলেন। একটু যাইয়াই পথে তাহাকে ধরিলেন। মনিব্যাগ হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এটী কি।" সে বলিল—টাকা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কত পয়সা হয়? ভিক্ষুক তাহা ও ঠিক বলিল। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বলিলেন, বাপু তুমি যদি আমার কাছে সত্য করিয়া বল যে

ঐ বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আর কখন যাইবে না, তাহা হইলে আমি তোমাকে এই টাকাটী দি। আমি ও সত্য করিতেছি আমি ঐ পাপিষ্ঠের আলয়ে আর কখনই যাইব না। ইহা বলিয়া টাকাটী ভিক্ষুককে দিয়া চলিয়া গেলেন। খানিক গিয়া ভাবিলেন সেত ভিক্ষুক একেবারে একটী গোটাটাকা পাইয়াছে, হয়ত ক্ষুধায় মরিবে তবুও টাকা ভাঙ্গাইয়া খাইবে না, ভাবিয়া আর দুইটী পয়সা তাহার হাতে দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত ধনী বাবু-টীর নামটী আমাদের বলেন নাই, কিন্তু একথা বলিয়াছেন যে তাঁহার বাটীতে সেই অবধি তিনি আর কখনও যান নাই। গরিবের প্রতি এত ভালবাসা কি আর কখন দেখিতে পাওয়া যাইবে!

কেহ কোথাও কোন প্রকার কষ্টে পড়িয়াছে শুনিলেই তিনি ভাবিয়া আকুল, কেমন করিয়া তাহার সেই কষ্ট দূরকরিবেন। যেন তিনিই তাহার একমাত্র আত্মীয়, তিনিই তাহার এক মাত্র সহায়। যে মানুষকে ভাল বাসে তাহার

এমনি হয়। ইহাতে অনেক ভাবনা ভাবিতে হয়, অনেক কষ্ট সহিতে হয়, অনেক ব্যয় বহিতে হয়, সত্য, কিন্তু ইহাতে যে একটু সুখ আছে তাহা স্বর্গীয় সুখ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভালবাসার কথা বলিবার নহে তাহা ভাবিবার জিনিস। উহা বচনাতীত, বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। সকল মানুষই যেন তাঁহার পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পুত্র কন্যা ছিল। এই জন্য তাঁহার কাছে পাছে কেহ যাইতে না পারে সেই ভয়ে তিনি স্বীয় দ্বারদেশে কখন দ্বারবান রাখিতেন না। সে জন্য তাঁহাকে কত কষ্ট ভোগই করিতে হইত। সময়ে সময়ে পীড়ার যাতনা সত্ত্বেও দিবানিশি লোকসমাগম, তাহার উপর প্রত্যেকের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে হইবে। সকলের সকল সংবাদ লইতেই হইবে, তাহা না হইলে তাঁহার হৃদয় মানিত না, মন সন্তুষ্ট হইত না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভালবাসার কথা বলিতে গিয়া তাঁহার পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার কথা না বলিলে তাঁহার ভালবাসার

বর্ণনা বিষম অঙ্গহীন হয়। মনুষ্য-প্রকৃতিতে সকল প্রবৃত্তির বীজ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে অন্তর্নিহিত থাকে, তবে যিনি যে প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করেন তাঁহার সেইটীই স্ফূর্ত্তি পায়। ভালবাসাও মানুষের সেইরূপ একটী হৃদয়ের অন্তনিহিত প্রবৃত্তি। জন্তুদের ভিতর যত উচ্চ স্তরে উঠা যায় যেন ভালবাসার সঞ্চার তত বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। সরীসৃপের ভিতর কিছুমাত্র ভালবাসার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। মৎস্যে যেন ভালবাসার একটু সূচনা আছে বলিয়া বোধ হয়, অন্ততঃ ইহাদের ভিতর আসঙ্গলিপ্সা আছে ও সরীসৃপের ন্যায় সন্তান দ্রোহিতা নাই, স্বজাতিহিংসা নাই, পক্ষীদের ভিতর তদপেক্ষা ভালবাসার চিহ্ন অধিক লক্ষিত হয়। পক্ষী পক্ষীকে ভালবাসে, পুষিলে পোষ মানে, যে পোষে তাহাকে ভালবাসে সর্ব্বদাই দেখা যায়। তৎপরে এক স্তর উঠিলে স্তন্যপায়ীদের ভিতর হস্তীর পালকপ্রীতি, কুকুরের প্রভুভক্তি, অশ্বের মনুষ্যানুরক্তি, ইহাদের নিজ সন্তানে স্নেহ, পরস্পর ভালবাসা অল্লাধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

তার পর মানুষের ভিতর যাহারা অশিক্ষিত তাহারা অপরকে ভালবাসিতে শিক্ষা না করুক অন্ততঃ আপনার সন্তানকে ভালবাসে। আবার যাহাদের তাহাও নাই তাহারা কুকুর, বিড়াল, পাখী প্রভৃতিতে সেই ভালবাসা নিয়োজিত করে দেখা যায়। ইহা কেবল মাত্র শিক্ষার অভাব, ভালবাসার বিকাশের চেষ্টার অভাব। ইহার সম্যক্ বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে হয়, শিক্ষা করিতে হয়, সাধনা করিতে হয়। এই চেষ্টা, শিক্ষা ও সাধনার দীক্ষাগুরু পিতামাতা। মানুষ জন্মিয়া বুদ্ধির প্রথম বিকাশের সঙ্গে, জ্ঞানের প্রারম্ভ হইতে, মাতা পিতার স্নেহ মমতা দেখিয়া, মাতা পিতার সংসর্গে থাকিয়া, তাঁহাদিগকে আপনা হইতে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে, পরে যত বয়স বাড়ে, জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, বুদ্ধির বিকাশ হয়, কৃতজ্ঞতায়, কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ও অপর নানা কারণে মাতা পিতার উপর ভালবাসা বৃদ্ধিপায় ভক্তির একাগ্রতা হয়। ক্রমে সেই একান্ত ভালবাসা বা ভক্তি এরূপ অবস্থায় দাঁড়ায় যে মানুষ জগতে পিতামাতাকে একমাত্র

ভক্তির আধার, ভালবাসার সামগ্রী আদরের জিনিস, সম্মানের পাত্র, পূজার পদার্থ, স্বর্গের দেবতা দেখে। তাঁহারা যেন প্রীত হইলেই জীবন সার্থক, তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাঁহাদিগকে প্রাণপণে সেবা করিতে পারিলে, সম্যক্ সমাদর করিতে পারিলেই হইল। প্রাণ আর কিছু চায় না। জীবনের উহাই ব্রত আর এ ব্রতের উজ্জাপন নাই। উজ্জাপন করিতে বাসনাও হয় না। পিতামাতা পীড়ায় ভিষক, শিক্ষায় গুরু, পরামর্শে প্রধান মন্ত্রী, জীবনের প্রধান সহায়, ইহা যিনি বোধ করিতে পারেন তাঁহার ভালবাসাই সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে। আবার যিনি তাহার উপর পিতা মাতাকে ঐহিক সুখের আকর এবং পারত্রিক মঙ্গলের হেতু মনে করেন, যিনি পিতা মাতাকেই ইষ্টদেবতা জ্ঞানে তদ্গত চিত্তে তাঁহাদের ধ্যান ধারণা, পূজা উপাসনা করেন, যিনি এই পিতা মাতাকে সেই পরম পিতা মাতা হইতে অভিন্ন বোধ করিতে শিখিয়াছেন তিনিই পিতামাতার মর্ম্ম বুঝেন, তাঁহাদের গুরুত্ব বুঝেন,

তাঁহাদিগকে ভালবাসেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে ভালবাসার পরিমাণ বাড়াইতে শিক্ষা করিবার পিতা মাতা ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই বলিয়া আমার ধারণা, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও বোধকরি সেই ধারণা ছিল। পিতা মাতা নিরক্ষর হইলেও অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক পুত্র তাঁহাদিগকে বিদ্বান,বুদ্ধিমান জ্ঞান করেন। ইহার দৃষ্টান্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে। যখন তিনি বিধবাবিবাহের বিচারে ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, শাস্ত্র তাঁহার স্বপক্ষে, যুক্তি তাঁহার স্বপক্ষে, রাজ পুরুষ গণ তাঁহার সহায়, তবুও তিনি পিতা মাতার অনুমতি না লইয়া সেই বিষম আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহাকে তাঁহার পিতা ভালই চিনিতেন, তবুও যেন তাঁহার মন পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি তিনি নিষেধ করেন তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় কি করিবেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন যে যত দিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন তিনি সে

বিষয়ের কিছুই করিবেন না, পরে তাঁহাদের স্বর্গারোহণ হইলে পর সেই আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিবেন। হিন্দুবালবিধবার বিষম কষ্টময় জীবন দেখিয়া তাঁহার অতুল দয়ার ভাণ্ডার, অসীম স্নেহের আধার, কোমল হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। সে প্রাণের জ্বালা তিনি মর্ম্মে সাহিয়া, অন্তরের বৃশ্চিক দংশন সহ্য করিয়া থাকিবেন তবুও পিতা মাতার মতের অন্যথা কার্য্য করিবেননা। এ কি কম ভক্তির কথা। এইত ভালবাসার পূর্ণ বিকাশ। সুবিধা মত ভালবাসিতে সকলেই পারে তাহাকে ভালবাসা বলে না। ভালবাসার জন্য যিনি যত টুকু স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন, যতটুকু আত্মসংযম করিতে পারেন, ক্ষতি স্বীকার করিতে পারেন, কষ্ট ভোগ করিতে পারেন, তাঁহার ভালবাসা তত অধিক। পিতা মাতার জন্য অবাধ্য ভাই ভগ্নীর অন্যায় আব্দার, কত লোকের কত অত্যাচার, সমাজের অবিচার, সকলই অম্লান বদনে সহিতে হইবে, তবে ত ভালবাসা। এ সকল পিতা মাতার

ভালবাসার যেন পরীক্ষা। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে পরীক্ষায় খুব উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, ইহ কালে তাঁহার অপার সুখ, পরকালে তাঁহার অনন্ত স্বর্গ। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেন, সকলের ভালবাসার এই একরূপ প্রকরণ। পিতা মাতাকে ভালবাসিলে তাঁহারা যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে ভালবাসিতে হইবে। ভাই ভগিনীকে ভাল বাসিতে হইবে, আত্মীয় কুটুম্বকে ভালবাসিতে হইবে, পুরবাসী, প্রান্তবাসী, স্বদেশবাসী সকলকে ভাল বাসিতে হইবে। সকলেই সেই পিতামাতার সম্পর্কে সম্পর্কিত তাঁহাদের পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাহাদিগকে ভালবাসিলে তাহাদের অন্যায় আচরণ, নিষ্ঠুর ব্যবহার ভুলিয়া, তাহাদিগকে ভালবাসিলে পিতামাতা সন্তুষ্ট হইবেন, কাজেই তাহাদিগকে ভাল বাসিতে হইবে। এইরূপে ভালবাসা একাধার হইতে ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে ভালবাসার বিকাশ হয়। ক্রমে ভালবাসা পরিবার ছাড়াইয়া স্বগ্রামে, গ্রাম ছাড়িয়া

দেশে, দেশ ছাড়িয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। আবার ক্রমশঃ পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উঠে, নর-লোক ছাড়িয়া পিতৃলোকে, পিতৃলোক ছাড়িয়া দেবলোকে এবং পরিশেষে দেবলোক ছাড়াইয়া ভালবাসা প্রেম ভক্তি প্রীতির একমাত্র আধার সেই সচ্চিদানন্দে বিলীন হয়। ইহাই ভালবাসার পবিত্র পরিণাম। কথাটা বড় জটীল হইয়া উঠিল। ছোট মুখে বড় কথা হইতেছে। এ সকল কথার বুঝি কি, যে তাহা বুঝাইব। ও কথা ছাড়িয়া যে কথা বলিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভালবাসা কেমন সার্ব্বজনিক, সার্ব্বকালিক ছিল। তিনি যাহা করিতেন,যাহা বলিতেন,যাহা ভাবিতেন তাহা সংশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায়,সকলকথার অন্তরে তাহার সেই কোমল হৃদয়, সেই ভালবাসা। তিনি দেখিলেন হিন্দু বালবিধবার কি কষ্ট। তাহাদের আজীবন কষ্ট। তাহারা ভাল খাইতে পায় না, পরিতে পায় না। জীবনে তাহাদের কোন সুখই নাই। তাহাদের জীবন একটা দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর ব্রত। সে বিষয়ে তাঁহার সহিত

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের মত বৈধ আছে একথা বলিতে সাহস হয় না, যাহা হউক তাহা সত্ত্বেও বলিতে হয়, বিধবার এই সকল শারীরিক দারুণ কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি সমাজ সংস্কারক বেশে বঙ্গ সমাজে অবতীর্ণ হইলেন। মানুষের কষ্ট দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, তজ্জন্য নিজের ক্ষমতার প্রতি একটু মাত্র লক্ষ না করিয়া ঋণ-দায়ে জর্জ্জরিত হইয়া ও পরের দুঃখ মোচন করিতে অগ্রসর। তাহাতে তাঁহার দিগ্‌বি-দিক্ জ্ঞান থাকিত না। সকলই তাঁহার সেই ভালবাসা পূর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক। তাঁহার জনৈক পরম বন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁহার একজন পার্শ্বচর বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বন্ধুর নিকট কিছু টাকা পাইতেন তাহা আদায়ের কোন উপায় নাই, ইহা উল্লেখ করায়, তিনি সাশ্রু-লোচনে বলিয়া ছিলেন কি তোমরা দুই চারি হাজার টাকার কথা বলিতেছ, আমি লক্ষটাকা দিতেছি কৈ আমাকে তাঁহার মত একটী বন্ধু মিলাইয়া দেও দেখি। তাঁহার অন্যতম বন্ধু

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রভাবতী নাম্নী ক্ষুদ্র বালিকাটীর মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ আন্তরিক ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ভালবাসার গভীরতা বেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। তদুপলক্ষে তিনি যে একটী প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে একটী নিঃসম্পর্কীয়া ক্ষুদ্র বালিকার জন্য মানুষে যে কত ভালবাসিতে পারে তাহা দেখা যায়। তাহার এক স্থানে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন "বৎসে তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যদি তুমি এত সত্বর পলাইবে বলিয়া স্থির করিয়া ছিলে, সংসারে না আসাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ছিল; তুমি অল্পদিনের জন্য আসিয়া সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গেলে, আমি যে তোমার অদর্শনে কি বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি তাহা তুমি একবার ও ভাবিতেছ না। আমার যে আহার বিহার, শয়ন, উপবেশন কোন সময়ে অণুমাত্র সুখ নাই। আহারের সময় অধিক দিন শোকসংবরণে অসমর্থ হইয়া নয়ন জলে অন্ন

ব্যঞ্জন দূষিত করি, একাকী উপবিষ্ট হইলে তোমার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করি; রাত্রি কালে শয়ন করিয়া অধিকাংশ সময়ই অনন্যচিত্তে তোমায় চিন্তা করি। কখন কখন ভাবনাভরে, যেন যথার্থই তোমার কথা শুনিতে পাইলাম, এই মনে করিয়া চকিত হইয়া উঠি। ফলতঃ তুমি যে আমায় কিরূপ যাতনায় নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছ, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব করিতে পারিতেছ না।" প্রবন্ধের শেষ ভাগে লিখিয়াছেন "বৎসে, তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না। একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাক যেন অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগে কালহরণ কর। আর যাহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইল, যেন তাঁহাদিগকে আমাদের মত যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।" ইহাই প্রকৃত হিন্দু আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ— ইহা হৃদয়ের দৌর্বল্য বলিয়া ঘৃণা করিবার জিনিস নয়। ইহা প্রকৃত ভালবাসা জনিত

হৃদয়ের আবেগ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। এই সম্বন্ধে আর এক দিনের কথা বলি।

কথাটা বলিতে যেন আমার মন সরিতেছে না,না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছিনা। তাঁহার স্বর্গারোহণের কিছু দিন পূর্ব্বে যখন তাঁহার শেষ পীড়ার প্রথম সূচনা হয়। একদিন তিনি একাকী বসিয়া আছেন, বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, আমি গিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ আপনি কেমন আছেন। তিনি বলিলেন, ভাল নয়। ক্রমেই অসুখ বাড়িতেছে। তাহার উপর এখানে পরিশ্রমের ক্রটী নাই, কাজেই সুস্থ হইবার উপায় নাই। আমি বলিলাম আপনি কর্ম্মাটাড়ে যাইলে থাকেন ভাল, আর সেখানে যাইলে অনেকটা বিশ্রাম ও হয়। কিছুদিনের জন্য তাহাই করুন না? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানে ও বড় ভাল থাকি না। এই কথা বলিয়া ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া পরে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করিয়া বলিলেন, বাপু সেখানে যাইলে থাকি ভাল বটে, কিন্তু আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য্য থাকিত তাহাহইলে সেখানে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম, মন ও ঠাণ্ডা থাকিত, শরীর ও সুস্থ হইত। আমার সে অদৃষ্ট কৈ? আমার সে ক্ষমতা কৈ? আমি সেখানে গিয়া দিব্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিব, আর আমার চারি পার্শ্বে অসংখ্য নরনারী বালক বালিকা অনাহারে মারা যাইতেছে দেখিব। এটা কি প্রাণে সয়। এই বলিয়া তিনি তথাকার লোকের দারিদ্র্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিরূপে যে ব্যক্তি একসের চাউলের অন্ন, আধসের অরহরের ডাল আধসের আলু ও একসের মাংস অনায়াসে ভক্ষণ করিতে পারে সেই ব্যক্তি প্রতিনিয়ত পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ হইয়া স্বভাবের অনিবার্য্য নিয়মে অল্পদিন মধ্যেই কালের করাল কবলে নিপতিত হয়। যখন তিনি এই সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন তাঁহার দুই নেত্র হইতে অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ হইতে

লাগিল ক্রমে স্বর বিকৃত হইয়া কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। আমার ন্যায় পাষাণহৃদয় নরাধম ও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু আমার অশ্রুপাত ও তাঁহার অশ্রুপাত বিভিন্ন কারণে। তিনি কাঁদিলেন দুঃখীর দুঃখের জন্য, আমি কাঁদিলাম তাঁহার জন্য। তাঁহার কান্না কেবল মানুষের দুঃখে, আমার কান্না সুখ দুঃখ মিশ্রিত এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে। আমি ভাবিলাম আমি কি মানুষের সহিত কথা কহিতেছি, না দেবতা সাক্ষাতে দাঁড়াইয়া আছি। যে ব্যক্তি পরের দুঃখে এত কাতর, তাঁহার হৃদয় সাধারণ নয়, সে দেব হৃদয় সে দেবতার স্নেহ, দেবতার ভালবাসা, দীন হীন মানবের একমাত্র সহায়। আমি চর্ম্মচক্ষে এ হেন দেবতা দর্শন করিলাম আমার জীবন সার্থক হইল। তাহার পর একটু সামলাইয়া বলিতে লাগিলেন। বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আস্ফালন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন

মরিতেছে তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে? যে দেশের লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশে আবার রাজনীতি কি? এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন যে টকথা আমি সে দিন, যে মানুষকে মানুষ কত দূর ভাল বাসিতে পারে তাহা দেখিলাম। এক জনের অন্নকষ্টে অন্যের হৃদয় যে এত ব্যথা পাইতে পারে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ইতি পূর্ব্বে এত পূর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট সম্পূর্ণ মনুষ্য দেখি নাই, এজন্মে আর কখন দেখিব সে প্রত্যাশা ও নাই। ইহাই বলি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, মানুষের দেবত্বে পরিণতি। এ হেন পূর্ণ পুরুষ সর্ব্বদা দেখা দেন না। দেবতা সর্ব্বদা ধরাধামে বিচরণ করিলে, এই জগৎই স্বর্গ হইত। বহুদিন অন্তর, স্থানে স্থানে এ হেন মানবের আবির্ভাব হয়। আমরা ধন্য যে তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার মূর্ত্তি মর্ম্মরে খোদিত করিয়া সে সুকোমল দেব হৃদয় পাষাণ ময় করিবার চেষ্টা করি ও না,

ধাতুর কাঠিন্যে পরিণত করিও না। সে সৌম্য প্রেমময় দেবমূর্ত্তি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি। সেখানে তাঁহাকে যেন মনশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া এক এক বার প্রত্যহ দর্শন করি, আর তাঁহার গুণ, তাঁহার চরিত্র, এবং সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সেই জগৎ জোড়া সুধামাখা ভালবাসার কণামাত্র পাইবার প্রার্থনায় একান্ত ভক্তি-ভরে তাঁহার চরণোদ্দেশে প্রত্যহ প্রণাম করি ও তাঁহার কাছে আমরা সেই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

সম্পূর্ণ

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২	বাল্মকী	বাল্মীকি
৩	১৫	ভুমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
৮	৪	সাক্ষাত	সাক্ষাৎ
১০	৩	তুহুকে	কুহকে
১৫	১৭	প্রভুত	প্রভূত
২৫	১৬	শোভ	শোভা
৩২	১৪	রক্ষণ	লঙ্ঘন
৫১	১২	ন	না
৬১	১৫	অন্তর্য্যামী	অন্তর্যামী
৬২	৪	অনুমাত্র	অণুমাত্র
৬৮	১৩	নিস্বার্থ	নিঃস্বার্থ
৭৩	১১	ওয়া	হওয়া
৭৬	১০	চিৎকার	চীৎকার
৮৩	৯	উজ্জাপন	উদযাপন
৮৬	৭	জটীল	জটিল

প্রয়াস সম্বন্ধে মতামত।

Calcutta Gazette, *26th January*, 1898.

"A collection of thoughtful and well-written essays on literary, social and miscellaneous topics."

Indian Mirror, *12th August*, 1897.

"There is some merit at least," as the poet says "in *attempting* well." But it is not a pure attempt, as the writer modestly calls his production, and, therefore, he deserves full credit for the entire merit. The book under notice is a collection of essays on various subjects which the writer contributed to the pages of some of the Bengali periodicals, present or past.

Some of the writings are of a literary or biographical character. There are some others which are modelled after Bunkim Chunder's inimitable *Kamala Kantar Duptar.* Though these are not strictly comparable with their prototype, they evince a good deal of original thought and power of facile expression on the writer's part. We are quite at one with the publisher, when he remarks that though some of the essays might not be considered sound from points of philosophy or logic, they are well calculated to afford entertaining reading to admirers of poetry in leterature and life.

Statesman, 29th June, 1897.

" PROYAS."—BABU SIVAPRASUNNA BHTTACHARJEE has reprinted and published in book form under this title a collection of poems which from time to time he had contributed to various Vernacular periodicals. They are well spoken of by those competent to judge of Bengalee composition, and will doubtless be widely read.

Amrita Bazar Patrika.

"PRAVAS."—This is the name of a neat little volume by Babu Shibaprasunno Bhattacharjee, B. L., containing about 20 essays on diverse subjects of interest. They had appeared before this in several Bengalee magazines of

the day. Babu Girija Prosonno Roy in the introductory preface written by him, states that the essays are in the nature of those written by the late Rai Bankim Chunder Chatterjee Bahadoor in his *Kamalakuntar Duptar.* The essays contain original thoughts of the writer, written in a lucid, chaste and dignified language. We welcome such books in the field of Bengalee literature and hope it will be a text-book in our Vernacular Schools.

The Prasad, 14*th March*, 1898.

DEAR SIR,

I have thankfully received the present of your book *Prayas*, that you have been so good as to send me.

I have been able to go through a few of the various subjects dealt with in the book, and I am glad to say that the articles bear evidence of rich fancy and a lucid diction, and that I enjoyed the reading very much.

The get up of the book too is excellent.

Yours truly,

JOTENDRO MOHUN TAGORE.

সময়, ১৫ ফাল্গুন, ১৩০৪।

প্রয়াস। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা ২৩নং কেথিড্রালমিশান লেন হইতে শ্রীগিরিশচন্দ্র মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৶০ দশ আনা মাত্র। বাঁধাই ও মুদ্রণাদি উত্তম। গ্রন্থে অষ্টাদশটী প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে দুই একটী ভিন্ন সকল গুলিই দার্শনিক গদ্য কাব্য। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট। গ্রন্থকার যে একজন সুরসিক, সুভাবগ্রাহী, সামাজিক ব্যক্তি তাহা তাঁহার রচনায় ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার গ্রাবুতে যে ওস্তাদি হাত দেখাইয়াছেন, আর কমলাকান্তকে মৌতাত পমাণ আফিং দিয়া বঙ্কিম বাবু যে দপ্তর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এ গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই সেইরূপ ওস্তাদী হাতে লিখিত এবং ঐরূপ ভাবের আবেশে সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত। সকল প্রবন্ধের সকল স্থান রুচি, অভ্যাস ও ধর্ম্ম বিশ্বাস অনু- সারে সর্ব্ববাদী সম্মত না হইলেও এ গ্রন্থে

শিক্ষার্থীর ও সামাজিক লোকের শিখিবার অনেক জিনিস আছে। এরূপ সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ পড়িতে আমরা সকলকেই অনুরোধ করি।

অনুসন্ধান, ১৭ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩০৪।

প্রয়াস।—শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও ২৩নং কেথিড্রাল মিসন লেন হইতে প্রকাশিত মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

শিবাপ্রসন্ন বাবুর নূতন পরিচয় আর কি দিব? তিনি অধিকাংশ সাময়িক পত্রের লেখক এবং "অনুসন্ধান" পাঠকের নিকটও সুপরিচিত। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার যে একজন সূক্ষ্মদর্শী ও ভাবুক, তাহা এই গ্রন্থে যে কোন একটি বর্ণিত বিষয় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। পুস্তক খানি উপন্যাসও নয়, কাব্যও নয়, কিন্তু অনেক উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক এবং অনেক কাব্য অপেক্ষাও কবিত্বপূর্ণ! কমলা-

কান্তের দপ্তরের পর এ শ্রেণীর পুস্তক এই নূতন।

জন্মভূমি, আষাঢ়, ১৩০৪।

প্রয়াস। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য দশ আনা। উত্তম বাঁধাই। নবজীবন, মালঞ্চ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে গ্রন্থকারের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে সেইগুলি তিনি একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম হইয়াছে,—প্রয়াস। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(১) ধরণী ও রমণী; (২) ধূপছায়া, (৩) সরস্বতী পূজা, (৪) শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, (৫) তৈল তত্ত্ব, (৬) তেলেজলে ঠাণ্ডা হয়, (৭) স্বাধীন বৃত্তি, (৮) আমাদের কন্যা, (৯) সত্য, (১০) স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে দুটি একটী কথা, (১১) গারির্বল্ডি (১২) আমাদের জাতীয় মহাসভা, (১৩)

সুনীতি ও সুরুচি, (১৪) সৌন্দর্য্য, (১৫) কাব্য ও কামিনী, (১৬) বিজ্ঞানবিভ্রাট, (১৭) বর্ণধর্ম্ম, (১৮) গৃহিণী।

প্রবন্ধগুলি মুখরোচকও বটে এবং শিক্ষাপ্রদও বটে। স্ত্রী বালক যুবক বৃদ্ধ—সকলেরই ইহা পাঠ্য।

বঙ্গবাসী, ২ অগ্রহায়ণ ১৩০৪।

প্রয়াস কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত শিবাপসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য দশ আনা। সাময়িক পত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই সকল প্রবন্ধই একত্র করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চিন্তাশক্তি, ধীশক্তি ও লিপিশক্তি—এই 'প্রয়াস' গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। হাইকোর্টের যেরূপ তিনি কৃতী উকিল, সেইরূপ তিনি কৃতী লেখক। সরস্বতী পূজা, ধূপছায়া, শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, আমাদের কন্যা, গ্যারিবল্ডি, কাব্য ও কামিনী,—এই

সকল প্রবন্ধ শিক্ষাপ্রদ, মাধুর্য্যময় এবং গবেষণা পূর্ণ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখন হাইকোর্টের উকিল, পসার প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন অবসর অল্প হইলেও প্রার্থনা বঙ্গসাহিত্যসেবায় তিনি যেন পরাঙ্মুখ না হন উপযুক্ত সন্তান মাতৃপূজায় কখন বিস্মৃত হন ন —ইহাই আমাদের আশা।

প্রয়াস। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি, অসুখীও হইয়াছি। সুখী হইয়াছি, ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া। অসুখী হইয়াছি, অবহেলার নিদর্শন দেখিয়া। গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী—বিদ্বান, বুদ্ধি মান এবং ভাবুক। কিন্তু যে পরিমাণ ভাবুকতা তাঁহার আছে, তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ এই সকল প্রবন্ধে হইতে পায় নাই। দ্রুতরচনাই বোধ হয় ইহার কারণ। ভূমিকাতেই দেখিলাম এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি প্রথমে সাম য়িক পত্রের জন্য লিখিত হইয়া ছিল। সাময়িক

পত্রে লিখিতে হইলে অনেক সময় দ্রুত রচনা অনির্ব্বার্য্য হইয়া পড়ে; এবং দ্রুত রচনায় ভাষার শিথিলতা ও ভাবের অপরিস্ফুটতা অবশ্যম্ভাবী—অন্ততঃ রচয়িতা যাহা দিতে পারিতেন তাহা দিতে পারেন না। শিবাপ্রসন্ন বাবুও এই কারণে যাহা দিতে পারিতেন, তাহা দিতে পারেন নাই। না পারুন, কিন্তু যাহা দিয়াছেন, তাহা সাদর গ্রহণ যোগ্য। প্রবন্ধ গুলির ভাষা লীলাময়ী, ভাব রসাত্মক ও হৃদয় গ্রাহী; এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান। পুস্তক পাঠ করিয়া সময় নষ্ট হইল বলিয়া আক্ষেপ কাহাকেও করিতে হইবে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী, ৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩০৫ সাল।

প্রয়াস। শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। শিবাপ্রসন্ন বাবু বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন। তিনি মাসিক পত্রিকা প্রভৃতিতে সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহারই কতকগুলি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রয়াসের ভাষা সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল। আমরা প্রয়াসের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি।